আয়ুষ্মতী

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

॥ ১ ॥

আনন্দ বেরোতে গিয়েও ফ্ল্যাটের দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল, বলেছিল, 'আশা-করি কিছু মনে করলে না, বা অতঃপর মনে কোন সঙ্কোচ রাখবে না। মানে, বলছি যে, একটু বেশী আশা করতে গিয়ে যেটুকু পেয়েছিলুম—সেটুকুও হারালুম না তো! মনের মধ্যে কোন পাঁচিল উঠল না এব দ্বারা—আবার নতুন ক'রে?'

'না না, তা কেন' নীলিমা বলেছিল, 'আপনি তো প্রস্তাব করার আগেই বলে রেখেছিলেন—উইদাউট প্রেজুডিস। যদি প্রস্তাব গ্রহণ-যোগ্য না হয়, কোন পক্ষেই তার জন্যে কোন ইল-উইল বহন করব না আমরা।—এই কথা বলিয়ে নিয়েই তো কথা পেড়েছিলেন।'

'ইয়েস্—য়্যাণ্ড আই মেণ্ট্ ইট্।· তবে এও বলে রাখি, আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়লুম না। এখনও আমি আশা করব, করতে থাকব যে একদিন তুমি মেল্ট্ করবে, সদয় হবে। তোমার শ্বশুরও কিছু চিরজীবী নন। তাঁব মৃত্যুব পর আর তিনি তোমাকে বেঁধে রাখতে পারবেন না—এই আশাই করতে থাকব।'

নীলিমা হেসেছিল। বলেছিল, 'আশা যে রাখে সে তার নিজের গরজেই রাখে। কিন্তু অতদিনই বা আপনি অপেক্ষা করবেন কেন? ভাল মেয়ের কি অভাব আছে কিছু দেশে? আপনাকে পেলে যে কোন মেয়েই নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করবে।'

'একজন তো অন্তত তা করছে না—সামনেই দেখছি। এর পর আর নতুন ক'রে ভেন্‌চার করতে যাওয়ার ভরসা নেই আমার।··· আচ্ছা,···চলি এখন।··· Au revoir!' চলে গিয়েছিল আনন্দ।

নীলিমার মনে হয়েছিল এতক্ষণ ওর হাসিতে কথাতে চেহারাতে এই ফ্ল্যাটটাই শুধু নয়—ওর জীবনটাও যেন কিছুক্ষণের জন্য আলোকিত হয়ে ছিল। সব আলো নিভে গেল এখন।...

তবু ফিরতেই হবে। ফিরতেই হয়েছে।

নিস্তব্ধ নিরানন্দ ফ্ল্যাটের মধ্যে এসে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে সে—প্রতিদিনের মতো। দিনরাতের ঝি রাখে না, অর্থের অভাবে ঠিক নয়, কারুর সঙ্গ ভাল লাগে না বলেই। ঝি একজন আছে, এই বাড়িরই অন্য ফ্ল্যাটে থাকে সে, দুবেলা ঠিকে-কাজ ক'রে চলে যায়। কীই-বা কাজ, রান্না নীলিমা নিজেই করে। বাসন-মাজা আর ঘর-মোছা—তাও এই তো একখানা ঘরের ফ্ল্যাট। সেও—এই আনন্দর চেষ্টাতেই সি. আই. টির এই ফ্ল্যাটটা পেয়েছিল তাই—এর আগে এক বাড়িতে পাঁচজনের মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকত, তাতেও এর চেয়ে বেশী ভাড়া পড়ত।

তবু, আজ যেন আপসোস হচ্ছে, ঝিটাও যদি থাকত! আজ যেন এই শূন্য ফ্ল্যাটটা গিলতে আসছে তাকে। মনে হচ্ছে যদি কেউ বেড়াতে আসত—কিম্বা অন্তত ইস্কুলের বুড়ো চাকর দেবেনটাও যদি আসত। কেউ এলে খানিকটা অকারণে বাজে কথা বললেও বেঁচে যেত সে।

অথচ এর কোন প্রয়োজন ছিল না। সবই পেতে পারত সে।

আনন্দ কৃতার্থ হয়ে যেত, হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেত। যা কিছু করবার সে ই করত, নীলিমা সম্মতি দিয়েই ধন্য করতে পারত তাকে। আর হয়ত, হয়ত তাহ'লে—ইহজীবনেই আবার সুখী হবার, আবার ঘর বাঁধবার একটা সম্ভাবনা থাকত, সে আশা শেষরাত্রের স্বপ্নের মতো ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হ'ত না।

কিন্তু সেটুকু পারল না।

বলতে পারল না যে, 'তোমার জন্যেই তোমাকে সুখী করা গেল না'। আনন্দই সর্বশেষ চূড়ান্ত কারণ—যার জন্য সেই-তার-

স্বামী-নামক জীবটা বেঁচে থাকতেও এই বেশ ধারণ করতে হয়েছে তাকে, এমন কাণ্ড ক'রে চলে আসতে হয়েছে।

হ্যাঁ, এও ঠিক যে—সে অপরাধ নীলিমা ক্ষমা করেছে—আনন্দর পরবর্তী ব্যবহারে, তার সত্যকার অনুতাপে। কিন্তু সেই উপলক্ষে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সে ভুলবে কি ক'রে? তাব অতখানি ঔদ্ধত্য, অতখানি ধৃষ্টতাও যিনি ক্ষমা করেছেন, এতখানি আঘাতের পরিবর্তে আশীর্বাদ করেছেন তাকে—সেই দেবতুল্য শ্বশুরের শেষ কথাগুলো সে ভুলবে কি ক'রে? ..

শূন্য ঘরে কতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে নীলিমা তা সে নিজেই জানে না। কখন সেই ভাবেই ঘুবতে ঘুবতে এক সময় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও না। একেবারে আয়নায় নিজের চেহারাটা প্রতিবিম্বিত হ'তে যেন চমক ভাঙ্গল তার। প্রতিদিনের অভ্যস্ত চেহারাই—তবু যেন আজ নতুন ক'রে নিজেকে দেখল সে।

শুভ্র নিরাভরণ বেশ, নিবিড় বৈরাগ্য ও বৈধব্যেব সজ্জা। অথচ এ-বেশ তার ধারণের কথা নয়। যার জন্যে, যার অভাবে এ বেশ ধরে হিন্দু বাঙ্গালীর মেয়েরা—সে মানুষ তাব আজও, এখনও জীবিত।

হ্যাঁ, আজও।

বিধাতার পরিহাস নয় এটা—ইংবেজীতে যাকে বলে আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা—তার ভাগ্য-দেবতা তা-ই করেছেন আজ তার জীবনে।

সে লোকটার সঙ্গে আজই দেখা হয়েছিল।

পথে দেখা হয়েছিল, তার পর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল এই ফ্ল্যাট পর্যন্ত।

আনন্দ আসবার খানিক আগেই গেছে সে।

এখানে এসে ঐ চেয়ারটায় বসেছিল। প্রায় আধ-ঘণ্টা ছিলও।

সে লোকটাও এই প্রস্তাব করেছিল। আবার সুখী হবার, আবার ঘর বাঁধবার লোভ দেখিয়েছিল।

এ-বেশ নিজের হাতে ঘুচিয়ে সধবা আয়ুষ্মতীর উপযুক্ত সজ্জায় ও বেশে সাজিয়ে দিতে চেয়েছিল—আবার নতুন ক'রে। বলেছিল, 'না হয় নতুন ক'রে বিয়ে করেছ এইটেই ভাববে লোকে। বিধবা বিয়েও তো হয়!'

বলেছিল, 'আমার তবফ থেকে কৈফিয়ৎ দেবার কিছু নেই, ক্ষমা চাইবারও যোগ্যতা নেই। তবু, তুমি তো অনেকবারই অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছ নীলিমা, আরও একবার কি করতে পারো না? আর একটিবাব আমাকে একটা চান্স দিতে পারো না প্রায়শ্চিত্ত করবার? মানুষ হবার?···তোমার এই বেশই একদিন—আমার মনের পশুটাব আড়ালে এখনও যে মানুষটা আত্মগোপন ক'রে আছে—চাবুক মেরে তাকে সচেতন করেছিল। সেই থেকে আজও তাকে আর ভুলতে দিই নি যে সে মানুষ। সত্যিই বলছি নীলিমা বিশ্বাস করো—ব্যবসাব দুরাশা ছেড়ে দিয়ে চাকরি করছি এখন, তিন বছর টিকেও আছি এক জায়গায়। এবার আর বোধহয় ভুল হবে না, আর ভুলব না—এই আঘাত!'

আশ্চর্য! শান্ত হয়ে নীলিমা শুনেওছিল সব কথাগুলো। ওর নির্লজ্জতায়, ওর ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে নি, গালিগালাজ ক'রে চেঁচিয়ে কোন নাটকীয় দৃশ্যেরও অবতারণা করে নি। শুধু বলেছিল, অনুত্তেজিত কণ্ঠেই, 'কোন নীচ কাজ করব না, কোন নীচতা প্রকাশ করব না—এ তোমার বাবার আশীর্বাদ। তোমার বাবাকে আমি সত্যিই ভক্তি করি, তাঁর আশীর্বাদকে সার্থক ক'রে তুলব জীবনে—এই আমার সাধনা। তাই তোমাকে কোন কটু কথা বলব না। তুমি এবার যাও। বিধবা-বিয়ের কথা বলছিলে না? বিয়ে তো মানুষের সঙ্গে পুরুষ মানুষের সঙ্গে হয় মেয়েদের। এই কথাটাই

ভেবে দেখো, উত্তর পাবে। তুমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলে যে চেয়ারটায় বসেছ—সে জায়গা সে চেয়ার আমাকে গোবরজলে ধোওয়াতে হবে। তোমার অপবিত্র দৃষ্টি আমার ওপব এতক্ষণ ধরে পড়ে আছে বলে এখন গিয়ে স্নান করতে হবে। তুমি যাও। আর কখনও এসো না'

চলে গিয়েছিল পবিত্র। আর বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হয নি তার।

সম্ভবত আর কোনও দিন আসবারও সাহস হবে না।...

বিধাতার পবিহাস বৈকি।...

স্বামীব জন্যেই তাদের ঘরের তাদের সমাজের মেয়েরা সাজসজ্জা করে, প্রসাধন করে,—যত্ন ক'রে সীমান্তে সিঁদুবের রেখা টানে, মণিবন্ধে প্রকোষ্ঠে অলঙ্কাব ধাবণ করে। অথচ সে স্বামীর জন্যেই সযত্নে এগুলো ত্যাগ করেছে; আজও আর ফিরে গ্রহণ করে নি সে বেশ, সে সজ্জা। কুমারীর বেশেও আর ফিবে যায় নি সে। এমন কি অল্পবয়সী বিধবারা যেমন কালপাড় সাদা শাড়ি পরে, হাতে দুগাছা ক'রে চুড়ি পরে—তাও পরে নি কখনও। শুভ্র থান কাপড়, আর সম্পূর্ণ নিরাভরণ দেহ—সেদিন, সেই দিনটি থেকে আজও এই বিচিত্র বৈধব্যের চিহ্ন বহন করছে।

বিধাতার পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যায় একে।

তার জীবন নিয়ে বুঝি অদৃশ্য ঠাকুরটির তামাসা করার বড় শখ। বারবারই তাই তামাশা করছেন তাকে নিয়ে।

তা নইলে কার জীবনে এমন অঘটন ঘটেছে?

সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে তার। স্পষ্ট।

শাশুড়ী হাহাকার ক'রে উঠেছিলেন, ললাটে করাঘাত ক'রে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'করলি কি হতভাগী—করলি কি! এ কী দেখালি আমাকে! ওরে আমি যে তার মা—

আমার সামনে এই মূর্তিতে বেরোতে বুক কাঁপল না তোর! এতটুকু মনে লাগল না।...তোরও ছেলে মেয়ে হ'তে পারে এক-দিন—আর ইষ্টের কাছে আজ থেকে নিত্য প্রার্থনা করব যে হোক্ তোব কোল জোড়া ছেলে-মেয়ে—সেই দিন এ আঘাতের মর্ম বুঝবি!'

শ্বশুব শুধু শিউরে উঠে চোখ বুজেছিলেন। একটি কথাও বলেন নি আর। কোন প্রকাব অভিযোগ অনুযোগের আভাস মাত্র দেন নি।

কিন্তু নীলিমা অত সহজে রেহাই দেয় নি তাঁদের।

সামনে থেকে সবেও যায় নি তাডাতাডি।

সে যা কবেছে তাব জন্য লজ্জিত নয় সে। বিন্দুমাত্র অনুতপ্তও নয়।

বরং আরও অনেক কিছু করতে পারত, অনেক প্রতিশোধ নিতে পারত। এ তো খুব কম, খুবই কম।...

সে ধীবে সুস্থে এগিয়ে এসেছিল। শাশুড়ীর সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণামও করেছিল।

কিন্তু পায়ে হাত দেয় নি তাঁর। দূর থেকেই প্রণাম ক'রে বলেছিল—'বৌ নই আর, বৌয়েব সম্পর্ক ধরে প্রণামও করি নি। আমি আপনার মেয়ের মতো। সেই হিসেবেই প্রণাম করছি। আশীর্বাদ করবেন না?'

শাশুড়ী গিবিজায়া তা পারেন নি।

আশীর্বাদ বেবোয় নি তাঁর মুখ দিয়ে।

আবারও হাহাকাব ক'রে উঠেছিলেন তিনি। ললাটে করাঘাত করেছিলেন বাববার। উঠে চলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে।

নীলিমা একটু হেসেছিল শুধু। নিরুচ্ছ্বাস হাসি। তারপর সেখানে থেকে সরে এসে শ্বশুরের সামনেও মাটিতে মাথা রেখে প্রণাম করেছিল।

জয়দেব সপ্ততীর্থ চোখ বুজেই ছিলেন—নীলিমা তাঁর ঘব থেকে বেরিয়ে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াতে সেই যে চোখ বুজেছিলেন আব খোলেন নি—এ প্রণাম তাই তাঁর চোখে পড়বার কথা নয়। নীলিমাও তা জানত। তাই সে সহজ শান্ত কণ্ঠে তথ্যটা জানিয়ে দিয়েছিল।

'আমি আপনাকে প্রণাম করছি বাবা। আমাকে আশীর্বাদ করবেন না ? আমি যা-ই ক'রে থাকি আপনাব কন্যার মতো।'

চোখ বুজেই আশীর্বাদ করেছিলেন জয়দেব।

একটু করুণ-মধুর হাসিও ফুটে উঠেছিল তাঁর মুখে।

সে হাসি দেখলে অন্য সময নীলিমা হযত শিউরেই উঠত। কারণ এ হাসি জযদেবেব অভ্যস্ত হাসি নয।

ছাত্র বা স্নেহাস্পদ কেউ প্রণাম কবলে প্রসন্ন মধুব হাসিতেই ভরে ওঠে তাঁব মুখ।

আজ সে হাসি ফুটল না। কিন্তু রূঢ় বা তিক্ত কথাও কিছু বলেন নি জযদেব।

আন্দাজে আন্দাজে হাত বাডিযে নীলিমার মাথায সস্নেহে ডান হাতখানি বেখে বলেছিলেন, 'আশীর্বাদ করব বৈ-কি মা, নিত্যই করব। তুমি যেখানেই থাক, যেমন ভাবেই থাক আমাব আশীর্বাদ তোমার কাছে পৌঁছবে। তুমি সুখী হও, শান্তি লাভ করো—যিনি সকলের পতি, তাঁকে লাভ ক'রে ধন্য হও। কোন মালিন্য কোন অশুচিতা না তোমাকে কোনদিন স্পর্শ কবতে পাবে, কোন ছোট কাজ না তোমাকে করতে হয ··প্রবৃত্তির তাড়নায কোনদিন না ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হও—ইষ্টের কাছে অহরহ এই প্রার্থনা করব। অন্যায়ের প্রতিবাদে যে কাজ করেছ তা যেন প্রবৃত্তি পূরণের কাজে কোন দিন না লাগে মা। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও, তোমার সম্বন্ধে আমার এতটুকু অভিযোগ, এতটুকু বিদ্বেষ নেই। শুধু, শুধু—বহু আশা ক'রে তোমাকে এনেছিলাম মা—বহু আশা করেই

চিরায়ুষ্মতী হও বলে আশীর্বাদ করেছিলাম, তোমার এই মূর্তিতে সে আশার সমাধি রচিত হ'তে দেখেই চোখ বুজেছি, আকস্মিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে। সে জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

নীলিমা এবার হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়েছিল, তারপর চলে এসেছিল তাঁদের সামনে থেকে।

চলে এসেছিল তাঁদের বাড়ি থেকেও—চিরকালের মতো।

যে বাড়িতে বধূ-বেশে এসেছিল সে, যে বাড়িতে তার আমরণ বাস করার কথা, যে বাড়িতে সে মন্ত্রপাঠ ক'রে সম্রাজ্ঞীর মতো এসেছিল, যেখানে একদিন সে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারত—সেই বাড়ি থেকে অপরিচিত অনাত্মীয় কোন বিধবার মতোই বেরিয়ে এসেছিল।

সব সম্পর্ক চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়ে।

॥ ২ ॥

এসব কথা আজ মনে পড়ত না নীলিমার।

আজকাল সে ভুলে থাকবারই চেষ্টা করে।

ভুলেও থাকে প্রায়ই। অনেক দিনই মনে পড়ে নি।

বোধ হয় পাঁচ ছ মাসের মধ্যে একদিনও না।

আজ হঠাৎ ঐ লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েই না—

মনে হ'তে এই নির্জন ঘরেও ঘৃণায় লজ্জায় শিউরে উঠল সে।

ওর মুখ দেখলেও অশুচি বোধ হয় নিজেকে।

অপবিত্র। অপবিত্র। অপবিত্র।

মনে মনে বারবার শব্দটা উচ্চারণ করতে লাগল সে।···

অথচ ঐ লোকটা বেঁচে থাকতে এ বেশ ধারণ করার কোন অধিকারই ছিল না তার।

তবু তো সে তা অনায়াসেই করতে পেরেছে। তার শ্বশুর মশাইও—সে কাজে বাধা দেন নি, অনুযোগ করেন নি। অনুনয়-বিনয়ও করেন নি,—একাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে।

বরং আশীর্বাদ করেছেন।

ছেলে জীবিত থাকতেও যে পুত্রবধূর বৈধব্য প্রত্যক্ষ করতে হ'ল তাঁকে—এক পলকের জন্য হ'লেও সে দৃশ্য যে কী সাংঘাতিক ভাবে তাঁকে আঘাত করেছিল আজ তা নীলিমার চেয়ে কে বেশী জানে? —সে জন্য তিনি এতটুকু দায়ী করেন নি সেই হতভাগিনী বধূকে। ছেলেকেই দায়ী করেছেন।

ঐ অপবিত্র পশুটাকে।

যদি অভিশাপ কাউকে দেওয়া সম্ভব হ'ত জয়দেব সপ্ততীর্থের তো সে ঐ পশুটাকেই দিতেন।

আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল নীলিমা।

সেদিনও ঠিক এই বেশ ছিল। এই বেশে সেজেই সেদিন তাদের শয়ন ঘর থেকে—যে ঘরে চিরায়ুষ্মতীর আশীর্বাদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একদা, তার সেই শ্বশুর-গৃহরূপ সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে।

অতর্কিতে একেবারে শ্বশুর-শাশুড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এর জন্য প্রস্তুত হয়েছে সে কয়েক দিন আগে থেকেই।

তারও আগে অনেক সময় লেগেছে তার মন স্থির করতে।

এ বড় সাংঘাতিক সংস্কার, সাংঘাতিক বাঁধন।

তার মনে যে আগুন জ্বলেছিল ঠিক সে আগুন না জ্বললে ও সংস্কার বুঝি পোড়ে না, যতখানি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়েছিল মনে, ততখানি না হ'লে ও বাঁধন কাটে না।

কিন্তু মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই আশ্চর্য একটা বল পেয়েছিল সে—আশ্চর্য একটা শক্তি লাভ করেছিল।

নিজেই গিয়ে কিনে এনেছিল থানধুতি। কিনে এনেছিল সাদা লংক্লথ কাপড়।

ঘরের মধ্যে বসে নিঃশব্দে সেলাই করেছিল সাদা কাপড়ের রঙীন রেখাহীন জামা।

কেউ টের পায় নি তার এ আয়োজন।

তার সংকল্পের কথা বলেছিল সে—একদিন শ্বশুর শাশুড়ীর সামনেই ঘোষণা করেছিল সে সংকল্প, কিন্তু তবু সে যে সত্যই একাজ করবে, ঠিক এতটা করতে সাহস হবে তার—আর এত শীঘ্র করবে —তা কেউ ভাবতে পারে নি।

তাই কেউ টের পায় নি—কখন সে বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে সোডা দিয়ে ঘষে ঘষে সিঁথির সেই উজ্জ্বল সিন্দুর রেখাটি তুলেছে —যা সব সীমন্তিনীর কাছেই একান্ত কাম্য, একান্ত গৌরবের।

কখন ঘরে এসে ঠুকে ঠুকে শাঁখা ভেঙ্গেছে এবং জোর ক'রে টেনে লোহা গাছাটা খুলেছে—কখন একটি একটি ক'রে সে তারই বাপের দেওয়া চুড়ি ও হার—এমন কি কর্ণভূষণটাকে পর্যন্ত খুলে ফেলেছে—তাও কেউ জানতে পারে নি। একেবারে নিরাভরণ শুভ্রতাতে নিজেকে আবৃত ক'রেই বেরিয়ে এসেছিল সেদিন।

সগু বিধবার বেশে!

আজও সেই বেশই বহন ক'রে চলেছে সে—এই আয়নায় যেমন দেখছে তেমনি।

নিবিড় কালো কেশের মধ্যে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক সিঁথি, কমল-কোমল প্রকোষ্ঠ ও মণিবন্ধ নিরাভরণ—পরনের জামা-কাপড়ও কোন প্রকার বর্ণ-সম্পর্কহীন। তবু এই বেশ দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল আজ ঐ লোকটা।

ঐ পশুটা।

না পশুও নয় সে। ওকে পশু বললে পশুদেরও অসম্মান করা হয়।

বরং বলা যেতে পারে ঐ কীটটা। নির্বোধ অধম জাতের কীটটা।

ওর সঙ্গে দেখা হতে দাঁত বার ক'রে হেসে বলেছিল, 'বাঃ, নীলিমা, সত্যিই বলছি, তোমাকে এই বৈরাগ্যের বেশে, এই রিক্ততার আভরণেও কী সুন্দর দেখাচ্ছে! কিন্তু তবু, এ বেশ কি বদলানো যায় না—আর একবার?'

বৌবাজারের মোড়, বেলা পাঁচটা কী সাড়ে পাঁচটা তখন। লোকে লোকারণ্য। সাহস হয় নি তাই।

নইলে অনেক বারই ইচ্ছা হয়েছিল পা' থেকে জুতোটা খুলে সে লোকটার গালে লাগায়—পর পর কয়েক ঘা।

কিন্তু তা সে পারে নি।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অবাঞ্ছিত ভিড় জমে যেত চারদিকে।

বহু লোক ঘিরে দাঁড়াত তাদের। শুরু হয়ে যেত বহু জবাবদিহি।

অপ্রীতিকর আলোচনা। অস্বস্তিকর ইতিহাসের উন্মোচন।

নিজেদের নোংরা কাপড় সকলের চোখের সামনে কাচা—ইংরেজীর সেই বিখ্যাত প্রবাদ-বাক্যের মতো।

তাই মুখ ঘুরিয়ে চলে এসেছিল শুধু।

একেবারে অপরিচয়ের ভান ক'রে--চোখে একটা ক্রুদ্ধ বিস্মিত ভ্রূকুটি টেনে এনে।

কিন্তু তাতেও লজ্জা হয় নি সে লোকটার, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—এই ফ্ল্যাট পর্যন্ত এসেছিল। ঢুকতেও দিতে হয়েছিল—নইলে অপর ফ্ল্যাটের লোকের কাছে বড় লজ্জায় পড়তে হয়।

তারপর অবশ্য তাড়িয়ে দিয়েছে—আনন্দর সাহচর্যও পেয়েছে তারপর—তবু সে অস্বস্তিটা যাচ্ছে না। সেই গা-ঘিনঘিনিটা। এখনও সর্বাঙ্গ রি-রি করছে তার, ক্লেদাক্ত অনুভূতি হচ্ছে একটা।

সে চলে যাবার পর মুখ হাত ধুয়েছে ভাল ক'রে, তবু গ্লানিটা যাচ্ছে না কিছুতেই।

এখন মনে হচ্ছে, একেবারে স্নান না করতে পারলে সহজ হ'তে পারবে না।...

॥ ৩ ॥

অথচ এসব কিছুই হবার কথা নয়।

আজ অত্যন্ত সুখী ও সার্থক দাম্পত্য জীবন যাপন করারই কথা। কোন দিকেই এত ক্ষোভ জমে ওঠাব কথা নয়।

পবিত্র এম-এ পাশ। ডবল এম-এ। বিখ্যাত অধ্যাপক জয়দেব সপ্ততীর্থের একমাত্র ছেলে সে। যে কোন ভাল কলেজে অধ্যাপকের পদ পাওয়া এক রকম সুনিশ্চিত।

পাত্র হিসেবে খুবই লোভনীয়—যথার্থ সুপাত্র।

দেখতে?

না, দেখতেও খুব খারাপ নয়। শুধু যা একটু রোগা—একটু বেশী ঢ্যাঙ্গা। কিন্তু তার যা মুখের ছাঁচ তাতে সেইটেই বেশী মানানসই, অন্ততঃ খারাপ দেখায় না।

আর নীলিমা?

সে নিজেও বি-এ পাস। শান্তিনিকেতনে পড়া মেয়ে। ছবি আঁকতে জানে, গান গাইতে জানে, নাচতে জানে। দেখতে তো খুবই সুশ্রী। ছেলেবেলা থেকে সুন্দরী বলেই খ্যাত। আত্মীয়-আত্মীয়ারা বলতেন সে-ই নাকি তার মার গর্ভের সেরা ফল। তাদের বংশের গৌরব।

অথচ—সে জানে, এটা বৃথা আত্মপ্রচার নয়—তার এতটুকু ঔদ্ধত্য বা অহঙ্কার ছিল না মনে বা আচরণে।

তার শ্বশুর মশাই নিজেও বার বার সে কথা বলেছিলেন বিয়ের পর।

'আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে যে ভীতি ছিল মা, তা তোকে দেখেই আমার ঘুচল। আমার এক ছেলে—এই পরিবারে কে

আসবে—কে এসে পড়বে—এ নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। কিন্তু মা আমি বেঁচে গেছি। তুমি আমার মা-জননী, সন্তানকে সব দুর্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি দিতে এসেছ।'

পবিত্রর সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল প্রথম মুসৌরীতে।

কুলড়ী বাজারের ঠিক ওপরে ওরা গিয়ে ছিল সেবার—একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে।

নীলিমারা ছিল কাছেই একটা হোটেলে।

বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তাতে আলাপ হয়েছিল দু'পরিবারে।

নীলিমার মা-ই বাঙ্গালী দেখে যেচে আলাপ করেছিলেন সপ্ততীর্থ মশাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে।

সে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'তে বিন্দুমাত্র দেরি হয় নি।

নীলিমার বাবা দিল্লী সেক্রেটারিয়েটে কাজ করেন—কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে বড় অনুরাগ তাঁর।

সপ্ততীর্থের পরিচয় পেয়ে তিনি একেবারে—বলতে গেলে মাটি-কামড়ে পড়লেন ওঁদের বাড়িব।

জয়দেব সপ্ততীর্থের নাম কে না শুনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা অধ্যাপক। সারা ভারতে অসংখ্য অধ্যাপক নিজেদের সপ্ততীর্থের ছাত্র পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করেন। এই ভাবে অকস্মাৎ সেই সপ্ততীর্থের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে, তা নীলিমার বাবা অহিভূষণবাবু কোন দিন ভাবেন নি। বিদেশে—বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে—একেবারে ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পড়ে থাকেন—হঠাৎ এতবড় এক বাঙালী শিক্ষাব্রতীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করবেন, সে সৌভাগ্য ছিল তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর।

বার বার এই কথাই বলতে লাগলেন অহিভূষণবাবু।

তাঁর বেড়ানো, আমোদ করা সব বন্ধ হয়ে গেল। বেড়ালেও

জয়দেব যখন বেড়াতে বেরোন, তখন কেবল মাত্র তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরেন।

ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই নীলিমার মা জয়দেবের প্রিয়দর্শন শিক্ষিত বিনয়ী ছেলেটিকে অবলম্বন করলেন। বাজার-হাট কেনা-কাটা—বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে যাওয়া—মায় মধ্যে মধ্যে বনভোজনের আয়োজন ইত্যাদি সব ব্যাপারেই পবিত্র হ'ল তাঁর প্রধান সহায়।

আর তার ফলে এই দুটি তরুণ তরুণীর যে একটু ভাবমধুর রোমান্টিক ঘনিষ্ঠতা হবে তার আর বিচিত্র কি!

কে জানে অরুন্ধতীও তা চেয়েছিলেন কিনা মনে মনে।

পবিত্রকে অমন ভাবে সহস্রপাকে জড়ানোর মধ্যে কোন গোপন অভিসন্ধিও ছিল কি না।

মেয়ে শিক্ষিতা, কলাবিদ্যা-নিপুণা সবই ঠিক। তেমনি সে যে বড়ও হয়েছে, বিবাহ-যোগ্য হয়েছে—তাতেও তো ভুল নেই।

আর মেয়েকে কোথাও চাকরি করতে পাঠিয়ে তার পয়সায় বসে খাবেন এ অভিপ্রায়ও যখন তাঁর নেই।

অরুন্ধতী বরাবরই ঘৃণা করেন এই ব্যবসাটাকে।

আর সে ঘৃণা তিনি গোপনও করতেন না। সকলকেই বলে দিতেন মুখের ওপর।

'আরও ঘৃণা এই জন্যে যে', তিনি বলতেন, 'দেখেছি কিনা—মেয়ে ভাল চাকরি ক'রতে শুরু করলেই বেশির ভাগ বাপ-মায়েদের কেমন মেয়ের বিয়ে দেবার ইচ্ছে লোপ পেতে থাকে। ভাল সম্বন্ধ পেলেও নানা ছুতোয় সেটা এড়িয়ে যায়। যারা খেতে পায় না তাদের কথা আলাদা, সেক্ষেত্রে আমি বাদই দিচ্ছি। কিন্তু যাদের অবস্থা ভাল কিংবা যাদের এটাকা না হ'লেও চলে, তাদেরও মেয়ের রোজগারের টাকায় কেমন মায়া পড়ে যায়। ···মেয়ের দিকটা তখন আদৌ চোখে পড়ে না। এই যে আমাদের পাড়ার তপতী

সরকার, গান গেয়ে খুব নাম হয়েছে, মোটা মোটা টাকা আনছে—ব্যস্, ওর বাপ-ভাই নির্বিকার। শুধু তাই নয়—মেয়েটাকে কোথা৽ বেরোতে পর্যন্ত দেয় না, কারুর সঙ্গে মিশতে দেয় না—সর্বদা চোখে চোখে রাখে। স্টুডিওতেই যাক আর জল্‌সাতেই যাক—হয় দাদা, নয় বাবা, নয় ছোট ভাই সঙ্গে যাবে। একা যাবার উপায় নেই। পাছে অমন পাকা ফলটা হাত-ছাড়া হয়ে যায়—পাছে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে নিজেই বিয়ে ক'রে বসে! এসব কি বাপ-মা? এরা তো রাক্ষস!'

সুতরাং তিনি নিজের কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হবেন বৈ কি!

আর সে ক্ষেত্রে, পবিত্রকে হাতের কাছে পেয়ে যদি কিছুটা অকারণ ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা ক'রে থাকেন তার সঙ্গে তো, খুব দোষ দেওয়াও যায় না।

এটা বিধাতার যোগাযোগ মনে করাও আশ্চর্য নয়।

সব দিক দিয়ে সুবিধা ক'রে দেবার জন্যেই হয়ত তিনি এমন ভাবে মুসৌরীতে টেনে এনেছেন এবার। নইলে আলমোড়া যাবারই তো সব ঠিক ছিল, হঠাৎ কর্তার কী যে খেয়াল হ'ল—মুসৌরী চলে এলেন।

শিক্ষিত সচ্চরিত্র ভাল ছেলে পবিত্র।

আর বড় নেটিপেটি। এরই মধ্যে কাকীমা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে, আত্মীয়ের মতোই ব্যবহার করে। বড় অমায়িক। বড় ভদ্র।

তাছাড়া ঠিক পাল্‌টি ঘর ওঁরা পরস্পরের। কুল-শীল ভাঙা কি রেজেষ্ট্রী বিবাহেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না।

বিধাতার যোগাযোগ ছাড়া কী বলবেন একে অরুন্ধতী?

হ্যাঁ—এখনও কিছু কাজেকর্মে লাগে নি সত্য কথা।

কিন্তু তার কারণ এ নয় যে কোন কাজ জোটে নি তার।

ডবল এম্-এ পাস, তায় যে বাপের ছেলে, আর কিছু না হোক্,

অধ্যাপকের একটা চাকরি তো কেউ ঘোচায় নি। সরকারী চাকরিরও একেবারে বয়স যায় নি ওর।

আর যদি চাকরি না-ও করে—খেতে পাবে না এমন অবস্থা ওদের নয়। জয়দেব সপ্ততীর্থের মোটা আয়—নানাদিক দিয়েই। মিতব্যয়ী লোক তিনি। তাছাড়া কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। কলকাতায় দু'খানা বাড়ি ওদের, এলাহাবাদে একখানা। কিছু না হোক্, কোন্ না—ব্যাঙ্কে বা কোম্পানীর কাগজেও কিছু আছে। ঐ তো একমাত্র সন্তান।

এই তো সেদিন গিরিজায়া কথায় কথায় বলছিলেন, 'খোকার আমার খুব ইচ্ছে একটা ব্যবসায় ঢোকে। ওঁব মনটায় আবার তা ঠিক সায় দেয় না। আমার শ্বশুর ছিলেন প্রোফেসর, আমার ভাসুরও তাই, ভাসুর-পোরাও সব ঐ লাইনে গেছে। এঁর হচ্ছে বংশের ধারাটা বজায় থাক, খোকাও এই লাইনে যাক। কিন্তু ওর যদি ভাল না লাগে—জোর ক'রে কিছু বলা কি ঠিক—কী বলো ভাই? আমি তাই বলেছি, থাক্ দুচার মাস কাদায় গুণ ফেলে এমনি বসে। এমন তো নয় যে, এখুনি রোজগার না করলে খেতে পাবে না। তবে আর অত ভাবনা কি?'

আর একদিন বলেছিলেন, 'তাও বলি পাগল ছেলেকে—ব্যবসা করবি তো কর—ওঁর কাছেও চাইতে হবে না, আমার নিজের কাছেই যা আছে তাই থেকেই তোর পাঁচ সাত হাজার পুঁজি যা যা লাগে দিতে পারব কিন্তু ওর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ—বলে বাপ-মায়ের টাকা ভেঙ্গে ব্যবসা করব না। যদি ডোবে তো চিরকাল—মুখে না হোক মনে মনে—দুষবে, অপদার্থ ভাববে। তোমরা অনুমতি দাও, ব্যবসা করি তো নিজের মূলধন আমি নিজেই জুটিয়ে নিতে পারব। শোন দিকি কথা!'

সুতরাং এ ছেলে যে রোজগার করতে পারবে না কোন দিন—তা কারও মনে আসে নি।

এ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করে নি কেউ।

মেয়ের বাপ-মা তো নয়ই। মেয়েও নয়।

না। সত্যিই সেদিন এসব কথা নীলিমার মনে আসে নি।

বরং সে-ও সেদিন এটাকে—এই হঠাৎ দেখা এবং পরিচয় হওয়াটাকে—বিধাতার যোগাযোগ, তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ বলেই মনে করেছিল।

মার মনের গতিটা কোন দিকে যাচ্ছে তা জেনেও সেদিন তাই বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হয় নি।

না, বরং একটু বুঝি খুশীই হয়েছিল। বিয়ে যে তাকে করতে হবে সে বিষয়ে সে তো নিশ্চিত।

এবং তাতে ওর আপত্তিও নেই।

আর তা যখন করতেই হবে—তখন এ পাত্রে আপত্তি কি ?

মনের দিকে যতদূর স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলা সম্ভব, তা মেলে দেখেছে নীলিমা।

অবশ্য ও সেদিন প্রথম দর্শনেই পবিত্রর প্রেমে পড়েছিল বললে ভুল বলা হবে।

প্রেমে ও পড়ে নি।

তবে খুব অপছন্দও হয় নি পবিত্রকে।

প্রেমে না পড়বার মতোও কিছু সে দেখতে পায় নি তার মধ্যে।

সুতবাং বিয়ে যদি করতেই হয় তো এমন পাত্রে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

কোথায় কার হাতে পড়বে, কী সম্বন্ধ ঠিক হবে—তা তো সে জানতেও পারবে না। তার চেয়ে বরং যাকে সে দেখতে পাচ্ছে চোখে, তাকেই বিয়ে করবে। মোটামুটি খারাপ কিছু নয়, এটা তো সে বুঝতে পারছে।

তাই মাব এ চেষ্টা খারাপ লাগে নি।

পাত্র হিসেবে পবিত্র যে অনেকের চেয়েই বাঞ্ছনীয় এটা সে মনে মনে নিজেও স্বীকার করেছিল।...

এভাবে সেদিন ও হিসাব ক'রে মন স্থির করেছিল—একথা শুনলে অনেক মেয়েই বিস্ময় বোধ করবে—তা নীলিমাও জানে।

কিন্তু তার মনের গঠনই যে ঐ রকম।

দৃপ্ত, তেজস্বিনী মেয়ে সে বরাবরই। ন্যাকামিকে তার বড় ঘৃণা। ন্যাকামি আর মেয়েলি-পনা—ছিঁচকাঁদুনে প্রেম—এর কোনটাকেই সহ্য করতে পারে না সে কখনও।

তা নইলে দিল্লীর মেয়ে সে, শান্তিনিকেতনে পড়েছে; সে সুন্দরী, সে নৃত্য-গীত পটীয়সী; তার প্রেমে পড়বার মতো ছেলের অভাব হয় নি কখনও! হ'লে বরং সে বাঁচত।

তাই সে যে তখনও পর্যন্ত পঞ্চশরবিদ্ধ হয় নি, তার কারণ তার ঐ মনের গঠন।

সারা জীবন যার সঙ্গে থাকতে হবে—জীবনটাই যার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে পাকে পাকে, তাকে একটু দেখে শুনে নেওয়া ভাল, যাচাই ওজন ক'রে, হিসেব ক'রে।

বয়স তার বেশী নয়, তবু অনেক দেখেছে সে।

তিন দিনের রঙ তিন ঘণ্টাতেই চটে যায়।

সব প্রেম, সব মধু-কল্পনা মিথ্যা হয়ে যায়—অনেক সময় এক রাত্রেই।

তারপর শুরু হয়—হয় কোন মতে পরস্পরকে সহ্য করা, কলহ অশান্তি—দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে বাকী জীবনটাকে টেনে নিয়ে বেড়ানো, নয় তো বিবাহ-বিচ্ছেদ, ছাড়াছাড়ি, কেলেঙ্কারি—জীবন ভরা তিক্ততা।

এই তো তার নিজেরই পিসতুতো বোন মলয়া—বড়লোকের আদরিণী মেয়ে, সুশ্রী, উচ্চশিক্ষিতা, বাবা-মা যে বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন সেই পাত্রপক্ষের সঙ্গে পাকা দেখারও পরে গিয়ে বিয়ে ক'রে বসল একটা প্রায়-বেকার গানের মাষ্টারকে। উঃ, কী কাণ্ড ক'রেই না গেল মেয়ে—বাপ-মায়ের মাথাটা চিরকালের জন্যে পথের ধুলোয় নামিয়ে দিয়ে—তার ওপর কী নিষ্ঠুর কথাই না বলে গেল সব তাঁদের। লাভ কী হ'ল? রোম্যান্সের রঙ দুটো বছরও তো রইল না। স্বামীর হাত ধরে পথে বসে ভিক্ষা করবে,

নয় তো পরের বাড়ি বাসন মেজেও খাওয়াবে সে স্বামীকে—এমনি নানা বড় বড় প্রতিজ্ঞা দুদিনেই কোথায় মিলিয়ে গেল। উদ্বাস্তু পরিবারের ছিটে বাঁশেব বেড়ার ঘরে, হ্যারিকেনের আলোতে, ধোঁয়াতে, ময়লা ছেঁড়াকাঁথাব বিছানাতে—সেই আদর্শ প্রেম এমন ঘুলিয়ে উঠল, নিত্য বাসন-মাজা জল-তোলা ও রান্না করার ফলে জীবনে এত বিতৃষ্ণা এসে গেল যে সেই আদর্শ প্রেমিক স্বামী যেন স্ত্রীব চোখে বিষ হয়ে উঠল। এখন মলযাদি জলপাইগুড়ির কোন ইস্কুলে মাষ্টাবি করছে, ছেলেটা আছে এখানে দিদিমাব কাছে। পিসেমশাই আব মেয়ের মুখ দেখবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে প্রতিজ্ঞা তিনি বেখেছেন। কেবল পিসিমাই শক্ত হয়ে থাকতে পারেন নি—'বেইমানের ঝাড' মেযেটাকে পুষতে রাজী হয়েছেন।

আরও দেখেছে।

দেখেছে সাহানাদিকে। প্রিয়দর্শন সবকারী কর্মচারী গ্র্যাজুয়েট ছেলে—বয়সে বরং সাহানাদির থেকে ছোটই হ'বে—সেই ছেলেকে যখন বাপ-মার অমতে বিয়ে করল সে, মনে হয়েছিল সাহানাদিই জিতল। বাপ-মার অমত—বামুন কায়েতের তফাত—এ সব আপত্তি বর্তমান যুগে একেবারে অচল। কিন্তু বিয়ের পরই দেখা গেল যে প্রেমে পড়াই অজিতের স্বভাব। সে আগেও পড়েছে অনেক বার—পরেও পড়বে। শেষ পযন্ত সাহানাদিকেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা ক'রে বাপের বাড়ি এসে উঠতে হ'ল। মাঝখান থেকে ওর বাপ-মায়ের বহু কষ্টের সঞ্চয় টাকাগুলি চলে গেল। সাহানাকে ত্যাগ করার আগে অজিত তার গহনাগুলো পর্যন্ত বেচে খেয়েছিল!

সুতরাং এ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নীলিমার রুচি ছিল না কোনদিনই।

তাই ইংরাজীতে যাকে বলে ফ্লার্টেশ্যন—একটু হাসি, একটু রঙ-তামাসা—চোখের ইঙ্গিত, হাতের চাপ, বাঁকা কটাক্ষ—এর বেশী কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্কই এগোতে দেয় নি সে।

আর এসব যাদের সঙ্গে করা যায় তাদের বিবাহ করা যায় না—তাও জানত সে।

তাতে না থাকে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কোন শ্রদ্ধা, না থাকে কোন বিশ্বাস।

শুধু তাই নয়—তার চেয়ে তার বাপ-মার অনেক বেশী অভিজ্ঞতা অনেক বেশী বিবেচনা, তাও সে জানে। সব দিক ভেবে তাঁরা যতটা কাজে এগোবেন—ততটা পারবে না সে! সুতরাং তাঁদেব নির্বাচনেব ওপর নির্ভর করাই বেশী শ্রেয় বলে মনে করত নীলিমা।

প্রথমটা এই নেতিবাচক পথেই এগিয়েছিল সে।

ওর অপছন্দ হয় নি—মার নির্বাচনে ওর আপত্তি নেই, শুধু এইটুকু।

কিন্তু কিছু দিন পবে দেখল মাব সঙ্গে ওর পছন্দটাও মিলতে শুরু করেছে।

পবিত্রর কথাবার্তা, তার সঙ্গ-সাহচর্য ভালই লাগছে।

তার আমুদে স্বভাব, দিলখোলা হাসি, ছোট-খাটো সব কাজেই তার অসীম তৎপরতা, আগ্রহ—ওকে শেষ পর্যন্ত একটু একটু ক'রে আকৃষ্টই করেছিল পবিত্রর দিকে।

তাই ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্যাসনেট্ লাভ'—তীব্র আবেগ-পূর্ণ, সর্বগ্রাসী প্রেম—তেমন কিছু বোধ না কবলেও, পবিত্রকে সে ভালবাসতেই শুরু করেছিল।

মা বোধ হয় এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

মেয়ের চোখের চাহনিতে তাঁর ঈপ্সিত আশ্বাস-বাণীটি পাঠ করার পর আর একটি মুহূর্তও কাল-বিলম্ব করেন নি তিনি।

সময়ও আর বিশেষ ছিল না হাতে। ওদের মুসৌরী প্রবাসের সময় শেষ হয়ে এসেছে। দুই পরিবারেরই। এঁর বিশ্ববিদ্যালয় খোলবার সময় আসন্ন—ওঁরও ছুটির দিন শেষ।

অরুন্ধতী পবিত্রর মার কাছে ভয়ে ভয়েই কথাটা পেড়েছিলেন প্রথমটা। গিরিজায়ার দুটি হাত ধরে জানিয়েছিলেন মিনতি।

নীলিমাকে যদি তিনি দয়া ক'রে পায়ে স্থান দেন।

গিরিজায়া তার জবাবে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন অরুন্ধতীকে।

বলেছিলেন, 'বাঁচালে ভাই, আমি কদিন ধরেই ভাবছি কী ক'রে কথাটা পাড়ব। নেহাৎ বরের মা যেচে বিয়ের কথা পাড়তে গেলে কনের মা ভাবে বরের কিছু দোষ আছে হয়তো—সেই সঙ্কোচেই শুধু পাড়তে পারছিলুম না। তাও আজকেই ভাবছিলুম যে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কথাটা পেড়ে ফেলব, যা থাকে কপালে। ওকে আমার বড্ড পছন্দ হয়েছে—দেখে ইস্তক মনে হয়েছে এ বুঝি বিধাতার যোগাযোগ!'

তারপর নিজেই ছুটে গিয়েছিলেন স্বামীর কাছে সংবাদটা দিতে।

জয়দেব প্রসন্ন হাসি হেসে বলেছিলেন শুধু, 'আমি তো ওঁকে মা-জননী ছাড়া ডাকিই না গো। আমার আর আপত্তি কি। কিন্তু তোমার দিকটাই তো দেখছ শুধু— তামার ঠাকুরেব ঘরকন্না, ওঁর কোন অসুবিধা হবে কিনা ভাবছ না!'

গিরিজায়া চমকে গিয়েছিলেন একটু।

ফিরে এসে বলেছিলেন অরুন্ধতীকে, 'তাও তো বটে। আমি তো শুধু আমাদের দিকটাই দেখছি। উনি ঠিক কথাই বলেছেন ভাই। মেয়ের মতটা জানা দরকার।...মানে আমাদের আবার নানান নট-খটির ঘর-কন্না তো। গৃহদেবতা আছেন, তাঁর ভোগ রান্না হয় রোজ—এ পর-গোত্রে হবার উপায় নেই। এই এখানে এসেছি আমার এক জাকে অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে রেখে এসেছি। তা এখনই ওকে গিয়ে তাই বলে হাঁড়ি ঠেলতে হবে না। আমার অসুখ-বিসুখ হ'লে এক আধ দিন—তা সে আমার পবুও পারে, অভ্যেস আছে।...না, তার জন্যেও নয়, খাওয়া-দাওয়ারও একটু

ফ্যাচাং আছে। মাংস ডিম এ সব বাড়িতে ঢোকে না। অবশ্য তাই বলে এমন কড়াকড়ি আইন নেই যে বাইরে গিয়ে কোথাও খেতে পারবে না। খুব ইচ্ছা হ'লে তোমার বাড়ি কি কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি কি হোটেলে গিয়েও খেয়ে আসতে পারবে—'

গিরিজায়ার কণ্ঠে মিনতির সুর। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় এমন মেয়ে, সে জন্য একটু ওকালতির ভঙ্গী যেন।

কিন্তু অরুন্ধতী তাঁর কথা শেষ করতেও দেন না—উজ্জ্বল মুখে বলেন, 'ও দিদি, এ মেয়ে বিধাতা তোমার জন্যেই সৃষ্টি করেছিল ভাই। ও তো কখনই মাংস খায় না। ছ বছর বয়সে পাঁঠার দোকানে ছাল ছাড়াতে দেখে পর্যন্ত সেই যে ওর মনে ঘেন্না হ'ল—চিরকালের মতো ছেড়ে দিল।...ডিম খায় মধ্যে মধ্যে—কিন্তু খুব পছন্দ করে না। মাছই খায় না অর্ধেক দিন, জাওলা মাছ তো খায়ই না—নোনা জলের মাছও খেতে চায় না খুব স্বেচ্ছাসুখে—ঐ পোনা মাছটা এ'লে একটু আধটু খায়।'

'তবে তো হয়েই গেল। মাছের কোন দুঃখ নেই আমার বাড়িতে। ওগো শুনছ'—'

এই বলে গিরিজায়া উঠে গিয়েছিলেন স্বামীকে এই সর্বশেষ সুসংবাদটি দিয়ে আশ্বস্ত করতে।

॥ ৫ ॥

এর পর আর কোন বাধা ছিল না এ বিবাহে। বাধা দেয়ও নি কোন পক্ষের কেউ।

অহিভূষণবাবু আকাশ থেকে পড়েছিলেন প্রথমটা—কিন্তু সে শুধু এতখানি কল্পনা করতে দেরি লেগেছিল বলেই।

তারপর বলতে গেলে আনন্দ নেচে বেড়িয়েছিলেন তিনি। লাফালাফি করেছিলেন সত্যি-সত্যিই ছোট ছেলের মতো।

পকেট থেকে দশটাকার নোট বার ক'বে হোটেল-বয়দের দিয়েছিলেন মিষ্টি কিনে খেতে।

ঠিক কী করলে তাঁর আনন্দটা যথাযথ প্রকাশ করা যায়, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না।

এক কথায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।

জয়দেব সপ্ততীর্থ যতটা পণ্ডিত ব্যক্তি বলে শুনেছিলেন অহিভূষণ—এ কদিনেব আলাপে বুঝেছেন যে—তিনি আরও অনেক বড় পণ্ডিত।

শুধু তাই নয়—দেবতুল্য চরিত্র তাঁর।

স্নেহে প্রেমে করুণায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, সত্যনিষ্ঠায়—এক আদর্শ মানুষ। সত্য যুগ থেকে ছিট্‌কে এসে পড়া লোক।

নিজে কখনও অন্যায় করেন না—মিছে কথা বলেন না। তাই বলে অপরের দুর্বলতা বুঝে ক্ষমা করার মতো ঔদার্যেরও অভাব নেই তাঁর মধ্যে।

অহিভূষণবাবু অনেক লোক দেখেছেন। খুব সত্য-নিষ্ঠ ন্যায়-নিষ্ঠ মানুষও দেখেছেন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এক একটি আপসহীন দুর্বাসা।

এ মানুষ আলাদা। একে শুধু ভক্তি করাই যায় না—ভাল-বাসাও যায়।

সেই জয়দেব সপ্ততীর্থ হবেন ওঁর আত্মীয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়!

তাঁর ছেলে হবে অহিভূষণের জামাই!

এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য, অচিন্তিত সৌভাগ্য!

সুতরাং আয়োজনেও কোন ত্রুটি হ'তে দেন নি তিনি।

কোন কার্পণ্য করেন নি কোথাও।

জিনিসপত্র গহনা কাপড় ঢেলে দিয়েছিলেন বলতে গেলে।

আপত্তি তুলেছিলেন বৈকি কেউ কেউ।

নীলিমার জ্যেঠামশাই, পিসেমশাই – আরও কোন কোন নিকট আত্মীয় আপত্তি তুলেছিলেন।

কারণ বিয়ের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে—

'ছেলে কী করে?'

সেইটেরই ভাল রকম সদুত্তর দিতে পারেন নি অহিভূষণবাবু। ঢোঁক গিলতে হয়েছিল কয়েক বার। এক কথার উত্তরটা বোঝাতে বহু কথার অবতারণা করতে হয়েছিল।

তাঁরা স্পষ্টই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, এ বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে। হোক্ না বিদ্বান, হোক্ না সে বিখ্যাত ব্যক্তির ছেলে—ধনীও হ'তে পারে হয়ত—তবু ছেলে কী করে বিয়ের আগে সেইটেই দেখা দরকার!

কিন্তু এ আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নি অহিভূষণবাবু, ওঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কাকে ঈর্ষারই বহিঃপ্রকাশ মনে করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত একটু রাগারাগিই হয়ে গিয়েছিল এ নিয়ে—কোন কোন নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে।

'আমার ছাগল আমি ল্যাজের দিকে কাটব—কার কি তাতে?'

এই স্পষ্টোক্তির পর সকলেই চুপ ক'রে গিয়েছিলেন, অপমানের ভয়ে।

কী দরকার অকারণ অপমানিত হ'তে যাবার?

তাঁদের কি? সত্যিই তো।

সুতরাং শুভবিবাহ নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

স্বেচ্ছায় বরযাত্রীদের যাতায়াত সব ব্যয় বহন করেছিলেন তিনি। টিমারপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁদের আসা যাওয়া ও ঘোরাঘুরির জন্য দু'খানা গাড়ি মোতায়েন ক'রে দিয়েছিলেন—এক কথায় কেরাণীর মেয়ের বিয়েতে (তা হোক না কেন অফিসার র‍্যাঙ্ক, একটু উঁচুদরের কেরাণী বৈ তো কিছু নয়।) যতটা করা উচিত তা না ক'রে রাজকীয় আয়োজন করেছিলেন কন্যার বিবাহে।

জয়দেব নিজে অহিভূষণবাবুর বিস্তৃত কোয়ার্টারে এসে উঠেছিলেন। তাঁরও সেবা-যত্নের আয়োজন যা হয়েছিল তা সাধারণত লোকে একমাত্র গুরুর জন্যেই ক'রে থাকে। সেজন্যে জয়দেব সপ্ততীর্থের লজ্জার অবধি ছিল না। ব্যাকুল হয়ে বার বার নিষেধ করতে গেছেন—বারবারই বৈবাহিকের নির্বন্ধাতিশয্য দেখে চুপ ক'রে যেতে হয়েছে তাঁকে। অহিবাবু একবার কেঁদেই ফেলেছিলেন বেশী বাধা দেওয়ায়।

জয়দেব সপ্ততীর্থ নগদ এক পয়সা না নিলেও, কোন অলঙ্কার বা দানসামগ্রীর দাবী না করলেও—গহনাতে, আসবাবে ও অন্যান্য দানে প্রায় দশহাজার টাকা খরচ করলেন অহিভূষণ।

এছাড়া আছে বরযাত্রী অবস্থানের রাজসূয় ব্যবস্থা, বিবাহের দিনের ব্যয়। করোল বাগ, টিমারপুর মায় সেই দূর দূরান্তের সুভাষনগর, গান্ধীনগর, রাজিন্দর নগর থেকে প্রায় তাবৎ বাঙ্গালী এসেছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে—দিল্লী নিউ-দিল্লীর তো কথাই নেই।

এতবড় বিবাহ এ অঞ্চলে নাকি বহুদিন হয় নি।

এদিকে কোন বিবাহেই ভূরিভোজের ব্যবস্থা হয় না এমন।

অবাঙ্গালী অতিথিরা চমকে উঠেছিলেন অনেকে।

নানারকম অতিথির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করতেও ভোলেন নি অহিভূষণবাবু।

ছুটি লাইফ ইন্সিওরেন্সের মোট ষোল হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েও চার হাজার টাকা ঋণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত বোধ করেন নি।

একমাত্র দুঃখ বোধ হয় এই হয়েছিল যে—আরও খানিকটা ব্যয় করতে পারলেন না—তাঁর এই একমাত্র কন্যার বিবাহে।

তার চেয়েও বড় কথা—তাঁর মনের মতো পাত্রের সঙ্গে বিবাহে।

কন্যাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন মনে মনে—জয়দেব সপ্ততীর্থের সঙ্গে এই আত্মীয়তা লাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য।

॥ ৬ ॥

শ্বশুরবাড়িতে এসেও ভাল লেগেছিল নীলিমার।

শ্বশুর তো সত্যিই দেবতুল্য লোক।

তুলনা হয় না এমন মানুষের।

কয়েকদিনের মধ্যেই নীলিমার মনে হ'ল—এই লোকটিই তার আসল বাবা। এতদিন যেন সে অন্য কোন পাতানো বাবার কাছে ছিল।

এত স্নেহ, এত প্রশ্রয় দিয়েই তিনি অভিভূত করেছিলেন নীলিমাকে।

গিরিজায়া অবশ্য সাধারণ সংসারী মানুষ। কিন্তু তিনিও খারাপ লোক নন।

তিনিও বধূকে ভাল বেসেছিলেন। তাঁর-মতো ক'রে।

একমাত্র-ছেলের বৌ সম্বন্ধে সাধারণত শাশুড়ীদের মনে যে একটা অহেতুক কুটিল ঈর্ষা দেখা দেয় বলে শোনা ছিল নীলিমার —যার জন্য একটু ভয়ই ছিল মনে মনে—সে ঈর্ষার কিছুই দেখল না এঁর মধ্যে।

প্রয়োজন মতো কিছু কিছু উপদেশ—তাও সস্নেহ উপদেশ দেওয়া ছাড়া কখনও কোন কারণে তিরস্কার কি কোন অনুযোগ করেন নি।

সে-ই বরং সেধে এগিয়ে গেছে তাঁকে রান্নার যোগাড় দিতে—তাঁর পূজোর কাজে সাহায্য করতে। খুঁটিনাটি গৃহস্থালী কাজ বুঝে নিতে।

দীক্ষা না হ'লে ভোগ রাঁধার অধিকার নেই—একথা সে শুনে এসেছিল অরুন্ধতীর মুখ থেকেই।

সে শাশুড়ীর কাছে দাবি জানাল, 'কিন্তু তাই বলে কি রান্নার যোগাড় দিতেও পারি না?'

'কে বললে পারো না মা। নিশ্চয় পারো, আর দেবে বলেই তো আশা করি। আমি বুড়ো হচ্ছি যে দিন দিন।'

'আর পূজোর যোগাড়? তাতে তো আর বাধা নেই।'

মহোৎসাহে এগিয়ে গিয়েছিল নীলিমা।

তার অনভ্যাসজনিত অপটুত্ব দেখে হাসতেন গিরিজায়া—কিন্তু খুশীও হতেন মনে মনে। সস্নেহে ভুল সংশোধন করতেন—হাতে ধরে দেখিয়ে দিতেন। বারবার ভুল হ'লে মৃদু তর্জনও করতেন কিন্তু তর্জনের পিছনে কোন জ্বালা থাকত না। কৌতুকই বেশী থাকত।

'বলি ও মেমসাহেবের বেটি—ওটা কী হ'ল আমার মাথা। এই বললুম না—বঁটি কাৎ না ক'রে উঠতে নেই!'

কিম্বা, 'আ আমার কপাল! অমনি ক'রে লাউ কোটে বুঝি! বলে অকাজে বউড়ি দড়, লাউ কোটে চড় চড়। ও তো কুমড়োর ডালনার কুটনো হচ্ছে—বিলিতী কুমড়ো!'

নিজের অকাজে নিজেই হেসে উঠত নীলিমা, রাঙা হয়ে উঠত লজ্জায়।

এক একদিন ছুটে এসে শাশুড়ীর কোলে শুয়ে পড়ে বলত, 'অমন করলে আমি কিচ্ছু করব না বলে দিচ্ছি। আমাকে ঠাট্টা করা!'

'বাপরে! তোমাকে কি ঠাট্টা করতে পারি! তুমি যে আমার গুরুজন—তুমি আমার বরের মা-জননী!'

হেসে উঠতেন শাশুড়ীও।

ভাল লেগেছিল পবিত্রকেও।

হাস্যে পরিহাসে কৌতুকে—বালকের অধম। ভাল না লেগে উপায় ছিল না।

স্বামী নয়, অনেকটা ছোট ভাইয়ের মতোই কাণ্ড-কারখানা করত সে।

আবার প্রেমিকের মতো নিত্য-নূতন উচ্ছ্বাসেরও অভাব ছিল না।

বকুল কি জুঁইয়ের মালা কিনে আনত রাত্রে বাড়ি ফেরবার সময়। পকেটে রেখে দিত লুকিয়ে।

রাত্রে শুতে গিয়ে পরিয়ে দিত বৌকে। বলত, 'পরো—পরে আলোতে দাঁড়াও—দেখি কেমন দেখাচ্ছে!'

সে হাত বাড়িযে আলো জ্বালতে যেত — নীলিমা দিত নিভিয়ে।

কৃত্রিম কোপে ধমক দিত, 'ও কী হচ্ছে। এখনও বাবা-মা জেগে আছেন না! চাকর-বাকররা ঘোরা-ঘুরি করছে। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। তোমার জ্বালায় কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব?'

বলত, 'আচ্ছা, এই যে মালা আনলে—কাল ভোরে আমি কোথায় লুকুই বলো তো। কেউ দেখলে কিম্বা গন্ধ পেলে কী মনে করবেন!'

পবিত্র বলত, 'কেন, তুমি কি আমার পরস্ত্রী যে তোমার জন্যে ফুল নিয়ে আসা অপরাধ!'

নইলে বলত, 'বাবা-মার কি যৌবনকাল ছিল না বলতে চাও, না বাবা কখনও বয়সকালে মার জন্যে ফুল কিনে আনেন নি? উনি কি চিরকালই এমনি গম্ভীর গ্রন্থকীট ছিলেন?'

নীলিমা ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলত, 'আঃ—ও কী হচ্ছে। তোমার মুখের একটু আগ্‌ঢাক্ নেই। গুরুজনদের সম্বন্ধে ঐ কথা বলে কেউ?'

'তাতে কি হয়েছে। নাও, আমরাও এক কালে গুরুজন হবো। ...তা বলে কী আমাদের আজকের জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে—না

এ জীবনের জন্য পরবর্তী কালে উত্তরপুরুষদের কাছে লজ্জা বোধ করব?'

এমনি সুখেই দিন কেটে যাচ্ছিল।

দু মাস কী তিন মাস।

একটানা নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়ে।

হঠাৎ নিজের সে সৌভাগ্যের নির্মল আকাশে মেঘ ডেকে আনল বুঝি নীলিমাই।

একটি বিষয়ে পবিত্রর বড় আপত্তি ছিল।

সন্তান যাতে না হয়, সে বিষয়ে সাবধানতার অন্ত ছিল না ওর।

এই সতর্কতা, তার জন্য বিভিন্ন অস্বস্তিকর আয়োজন—নীলিমার ভাল লাগত না একটুও।

প্রথম প্রথম কিছুদিন সে কিছু বলতে পারে নি।

প্রথমত এ সব বিষয়ে ছিল তার অপরিসীম অজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক সঙ্কোচ।

প্রথম দিকে কৌতূহলে বিস্ময়ে, কেমন এক রকম অজ্ঞাত আশঙ্কায়, চুপ ক'রে থাকত সে।

যখন বুঝল—ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, তখনও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না।

এই সব ব্যাপার নিয়ে বুঝি স্বামীর সঙ্গে কেউ আলোচনা করে? ছিঃ!

তাছাড়া ওরা পুরুষ মানুষ, এসব বোঝে কত!

ভাল বুঝেছে বলেই করছে নিশ্চয়।

কিন্তু যখন দিনের পর দিন একই ঘটনা ঘটতে লাগল—তখন ওর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

মানব-জীবনের যা স্বাভাবিক নিয়ম, দাম্পত্য জীবনের যা স্বাভাবিক পরিণতি—তাতে এত কী অসুবিধা, এত কী বাধা!

যা সহজ, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ—তাকে এমন ক'রে অস্বাভাবিক, অস্বচ্ছন্দ, কঠিন ক'রে তোলবার দরকার কি ?

ভালও লাগে না তার।

গা ঘিন-ঘিন করে এই সব আযোজনে। তার রুচিতে বাধে। সংস্কারে আঘাত লাগে।

কেন, কেন, কেন?

তাহ'লে বিবাহের প্রয়োজন কি?

তাছাড়া—তাব মনের অবচেতনে আর একটা বিশ্রী সন্দেহ উঁকি মেরেছিল কিনা কে জানে!

তবে কি লোকটার প্রাক্তন অভিজ্ঞতা কিছু আছে?

নইলে এসব জানলে কেমন ক'রে, শিখল কোথায় এসবের এমন নিপুণ প্রযোগ? ·

একদিন সব কুণ্ঠা, সব সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে প্রতিবাদ করল সে।

'এত ভয় তোমার কেন? হ'লই বা না হয় ছেলেমেয়ে। বিয়ে তো করে মানুষ এসব হবে বা হ'তে পারে জেনেই। বাবা-মাদের তো এটা একটা বড সাধও!'

'এই তো—তোমবা মেয়েরা যত লেখাপড়াই শেখো—সব সমান। বাবা-মায়েদের দোহাই দিচ্ছ কেন? বলো না যে তোমারও সাধ।'

'তা তাতেই বা দোষ কি? সে সাধের কি আমার বয়স হয নি? বাইশ বছর বয়স হ'ল যে!

'তা হোক। সাধটা কিছু দিন চেপে রাখ বাপু।'

'তা আমি রাখতে রাজী আছি। তা হ'লে দুজনেই ব্রহ্মচর্য পালন করি এসো—। ওসব ভয় আর থাকবেই না!'

'বা রে। তাহলে বিয়ে করলুম কেন?'

'আমরাও ঐ উত্তর। যদি ছেলেপুলেতেই এত ভয়—তাহ'লে বিয়ে করলে কেন?'

'না, তুমি বড় ছেলেমানুষ, এমন কী আমার চেয়েও।'

'তাই তো, সেটা তো বড় আশ্চর্যের কথা। তোমার চেয়ে বেশী ছেলেমানুষের মতো আচরণ করব—এ বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার, না? তোমার কী বিশ্বাস, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী?'

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল নীলিমার গলা।

এবার বিব্রত না হয়ে পারে নি পবিত্র। রফা করবার সুরে, মিনতি ক'রে বলেছিল, 'আঃ—তুমি এত বোঝ এটা বুঝতে পার না যে—এক পয়সা এখনও রোজগার করতে শিখলুম না, কাপড়টা জামাটা জুতোটা, সব এখনও বাবার পয়সায় চালাতে হচ্ছে—এমন কি তোমার খোঁপার মালাটা পর্যন্ত—তার ওপর আবার ছেলে হওয়াটা—না না, সে বড় লজ্জার কথা!'

'তা সেই লজ্জাটা আগে নিবারণ করলেই তো পার।'

'কেমন ক'রে? কী লজ্জা?

সত্যিই বুঝতে পারে নি পবিত্র।

'টাকাটা রোজগার করতে শুরু করো। তাহলেই এই লজ্জার কারণ থাকবে না!'

'দাঁড়াও, টাকা রোজগার করা কী এত সোজা!'

'কঠিনই বা কি। এই তো কাল নিজে কানে শুনলুম, বাবা কাল বলছিলেন—সগর ইউনির্ভাসিটিতে লেক্‌চারারের কাজ খালি আছে। সে তো তোমাকে শুনিয়েই বলছিলেন মনে হ'ল।'

'রক্ষে করো বাবা! ঐ একপাল গোরু নিয়ে সারা দিন বকর বকর করা—ও আনার পোষাবে না। ও বাবারই ভাল।'

'তা হ'লে কী পোষাবে তোমার—কী কাজ করতে পারো—সেইটেই করো না হয়!'

'বিজনেস ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।'

'তা সেটাই তাহ'লে শুরু করো।'

'করব করব, দাঁড়াও। শুধু হাতে তো হয় না—এথি চাই।'

সে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে টাকা বাজানোর ইঙ্গিত করে।

'তা টাকাই যখন নেই—তখন ব্যবসার কথা মুখে আনছ কী বলে! তাহলে কাজই ছ্যাখো!'

'তা কেন। দাঁড়াও না, টাকা যোগাড় কবতে হবে। নেই বলে হাল্ ছেড়ে দিলে তো চলবে না।'

'সেটা কী ভাবে যোগাড় হবে? বৌয়ের আঁচলমুড়ি দিযে ঘরে বসে থেকে আর খেলা দেখে?'

'তাই কি আমি বলছি! বা রে। তুমি বড় উল্‌টো উল্‌টো কথা বল! আমি আর তোমাব সঙ্গে বকতে পারছি না!'

রাগ ক'রে পিছন ফিরে শুয়েছিল পবিত্র।

এই ওদের বলতে গেলে প্রথম দাম্পত্য কলহ।

কলহও একে বলা চলে না। সামান্য হাসিঠাট্টা করতে করতে কথা-কাটাকাটি, এমন তো হামেশাই হয়।

কিন্তু নীলিমার মনটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ওর মনে হয়েছিল, এই প্রথম যে, তার স্বামীর মধ্যে পদার্থ খুব কম।

একটা নাম না-জানা আশঙ্কায় যেন অতিরিক্ত ভারী হয়ে উঠেছিল সমস্ত অবচেতনা।

এটাকে ঠিক গুরুতব কিছু বলা যায় না—তা সেও স্বীকার করেছিল মনে মনে, তবুও—

তবু কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারল না ব্যাপারটা।

পবিত্রর চরিত্রের যে দিকটা উদ্‌ঘাটিত হ'ল এই কটি কথায়—সেটাই কী ওর স্বরূপ?

শিউরে উঠল কথাটা ভাবতেই।

কে জানে—এটা অদৃষ্ট দেবতারই একটা হুঁশিয়ারী। কি না!

অবশ্য এ আশঙ্কাটা নিতান্তই নীলিমার নিজস্ব।

পবিত্র আদৌ গুরুত্ব দেয় নি কথাটায়।

ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভবত ভুলে গিয়েছিল সে।

অথবা মনে থাকলেও উড়িয়ে দিয়েছিল।

মেয়েরা অমন বক-বক করেই। তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা-ঘামানোই ওদের স্বভাব।

কিন্তু পরদিন রাত্রে একেবারে বেঁকে দাঁড়াল নীলিমা।

বলল, 'না, আর না।'

'তার মানে?'

'তার মানে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো আগে—তারপর।'

'টাকা রোজগার না করলে বুঝি আর স্বামীকে স্বামী বলে মনে হয় না? মানুষের মূল্য তা হ'লে স্ত্রীর কাছেও—ঐ একই নিক্তিতে, একই কষ্টিপাথরে যাচাই হয়?'

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ পবিত্রের কণ্ঠে।

'না, তুমি ভুল বুঝো না। টাকা রোজগারের কথা আমি বলি নি। সেই চেষ্টা তুমি করো—তাহ'লেই আমি খুশী।'

'কেন—তোমার কি খাওয়া-পরার খুব অসুবিধা হচ্ছে?'

'আবারও তুমি ভুল বুঝছ। আমি তোমার উদ্যমটাই দেখতে চাইছি—উদ্যমের ফলটা নয়। আমি তোমার মধ্যেকার পৌরুষটাকে জাগাতে চাইছি।'

'সে পৌরুষ কি জাগবে—তাকে বঞ্চিত ক'রে?'

'ক্ষতি কি! যে কোন আঘাতেই যদি সে জাগে তাহলেই তো আমার বড় লাভ!'

আর এক প্রস্থ কথা-কাটা-কাটি হয়েছিল।

তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষিত হয়েছিল পরস্পরের প্রতি।

এতদিনের রোমান্স, এতদিনের প্রেম—তিলে তিলে গড়ে ওঠা স্বপ্নপ্রাসাদ—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, টুকরো-টুকরো হয়ে খসে পড়েছিল।

পবিত্রর মুখ থেকে শিক্ষার মুখোশটা খুলে পড়েছিল একেবারেই —উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল ওর ভেতরের স্বরূপ, পশুটা।

শিউরে উঠেছিল নীলিমা তা দেখে।

মাথা কুটেছিল মনে মনে।

কিন্তু তবু আত্মসমর্পণ করে নি কিছুতেই।

পাথরের মতো কঠিন হয়ে ছিল সে।

কলহ বিদ্রূপ মর্মান্তিক আঘাত—শেষে অনুনয় বিনয়, হাতে পায়ে ধরাধরি—কিছুতেই সে কোমল হয় নি।

এমন কী অভিমানাহত অনুতপ্ত পবিত্রব চোখের জলেও না।

॥ ৭ ॥

এই আঘাতেই কিন্তু কিছুটা কাজ হয়েছিল।

অন্তত তাই ভেবেছিল নীলিমা।

সত্যিই কিছুটা উত্তম, কিছুটা কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছিল।

সেদিন ওদের দাম্পত্য-কলহের কিছু আভাস গিরিজায়াও পেয়েছিলেন সম্ভবত।

পরের দিন বধূকে কাছে বসিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার রাত্রি জাগরণ ক্লিষ্ট আরক্তিম চোখ দুটির দিকে চেয়ে সেই প্রশ্নই করেছিলেন, 'হ্যাঁ মা—কাল কী তোমাদের কিছু রাগারাগি হয়েছিল? সত্যি ক'রে বল্ তো মা। কিছু লুকোস নি। আমি যে মা হই। পবুও দেখলুম শুকনো মুখে পাশ কাটিয়ে চলে গেল—আমার দিকে ভাল ক'রে তাকাতে পর্যন্ত পারল না—তোরও চোখ জবাফুল, চোখের কোলে কালি। ব্যাপারটা কী?'

লজ্জায় জিভ কেটে শাশুড়ীর কোলের মধ্যে মুখ লুকোলেও শেষ পর্যন্ত নীলিমা গোপন করে নি কিছু। উপলক্ষটা বাদ দিয়ে কলহের হেতুটা খুলে বলেছিল।

শাশুড়ী ওকে তিরস্কার করেন নি। বরং উৎসাহই দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বেশ করেছিস মা। ধিক্কার দিলে তবে যদি নড়ে। আর ও ব্যবসা-বাণিজ্য ওর দ্বারা যা হবে তা আমি জানি। কিছু টাকা পাঁচজনের ডুবিয়ে অমনি ঘরে এসে বসবে।…কিন্তু সে না হ'লে তো চৈতন্যও হবে না ওর। কাজেই যত শিগ্‌গির ও-পর্ব চুকে যায় ততই ভাল!'

এ কথাটা পবিত্রর শ্রুতিগোচর ক'রেও বলেছিলেন গিরিজায়া।

আর হয়ত তাতেও খানিকটা কাজ হয়েছিল।

পবিত্র কদিন ঘোরাঘুরি ক'রে সত্যিই কিছু টাকা যোগাড় করেছিল।

বন্ধুবান্ধবেব অভাব ছিল না ওর। তার মধ্যে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেও বেশ কজন ছিল।

তা ছাড়াও যা ছিল, তা হচ্ছে ওব বাবার অসংখ্য ছাত্র।

সুপ্রতিষ্ঠিত, অবস্থাপন্ন, কৃতী ছাত্র সব।

গভীব শ্রদ্ধা কবতেন তাঁরা জয়দেব সপ্ততীর্থকে।

সম্ভবত সে শ্রদ্ধাব সুযোগ-সুবিধাও আদায কবিতে ছাড়ে নি পবিত্র।

পবিত্র প্রথম কবল একটা ছাপাখানা।

পুরোনো একটা ছাপাখানা সস্তায কিনে, নিজেকে খুব খানিকটা বাহবা দিল। খুব জিতেছে সে।

নীলিমাকে বোঝাল, ব্যবসায় বেচাব চেযে কেনার সময়ই আসল বুদ্ধির দরকাব। কারবারের লাভটা আসলে ঐ খানেই।

কিন্তু, কযেকদিন পবেই দেখা গেল যে জিতেছে সে প্রেসের সেই প্রাক্তন মালিকই। বহুদিনেব পুরোনো টাইপ, ভাঙ্গা একটি ছোট সাইজের ট্রিড্‌ল্ মেশিন এবং অব্যবহার্য সাজ সবঞ্জাম—যে দাম হওয়া উচিত তার চারগুণ দামেই বেচেছে সে।

সে জবাজীর্ণ সাজ-পাট ও কয়েকটি চোর কর্মচারী নিয়ে দিন-কতক থিয়েটারের রাজা-সাজার মতো প্রেসের মালিক সাজা যায়—তার বেশী কিছু নয়।

যে কয়েকটা কাজ ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিল সে, সে কাজও ঠিক ঠিক তুলে দিতে পারল না। কেউ সোজাসুজি সে কাজ বাতিল ক'রে দিল, কেউ দাম কাটল—কেউ যদি বা নিল, সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিল যে—এই শেষ। আর যেন তাদের কাজ পাবার আশা না রাখে পবিত্র।

সুতরাং সে প্রেস দালাল লাগিয়ে সিকি কড়িতে বেচে দেওয়া ছাড়া পথ রইল না আর।

অবশ্য পবিত্র তাতে বিন্দুমাত্রও দমল না।

মাকে আর নীলিমাকে বোঝাল, 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে!...মাড়োয়ারীদের মধ্যে নিয়ম আছে যে, যতবার গণেশ ওল্‌টায়, মানে কারবারে ফেল মারে সে তত ধার পায় মহাজনদের কাছে। ঠকেই তো শেখে লোক। না ঠকলে আর ঠেকলে শিখবে কোথা থেকে। এই তো হ'ল অভিজ্ঞতা—কারবারের আসল মূলধন!'

এবার সে বসাল কাঠের ঘানি। তেলের কারবার শুরু করল।

না, ও একেলে ইলেক্‌ট্রিক কাঠের ঘানি নয়। সোনার পাথর-বাটিতে ওর বড় ঘৃণা।

একেবারে আসল বলদে-টানা ঘানি। বলদ লোক সব ঠিক করেছে। সেই বিহারের দেহাত থেকে লোক এসেছে। তিন-পুরুষে কলু তারা। অপর ঘানির ফেলে দেওয়া খোল থেকেও সে তেল বার করতে পারে।

টাকায় টাকা লাভ এতে। খেতে খেতে মাকে বোঝাল পবিত্র।

বাঙালী তেল না খেয়ে যাবে কোথায়?

আর যদি এমন খাঁটি তেল পায় তো—অন্য তেল খাবেই বা কেন?

বাড়ি ঠিক হ'ল, ঘানিও বসল। বলদ একটা এসে কোন্ গোয়ালার বাড়ি পড়ে পড়ে শীর্ণ হয়ে গেল। ওয়াগন বোঝাই সর্ষে এসে ইয়ার্ডে পড়ে ডেমারেজ খেতে লাগল। কিন্তু ঘানিটা চালু করা হ'ল না—কারণ ঠিক এই সময়ই, আগের ব্যবসার কঠোর পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করতে—পবিত্র কয়েকদিনের জন্য এক বন্ধুর দেশে গেল শিকার করতে।

সেখান থেকে কাশ্মীরের শিকারায় গিয়ে পৌঁছল যে কী ক'রে তা এরা কেউ জানে না।

তিন মাস পরে যখন ফিরল তখন সে সর্বে জলে পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বলদটা মৃত। সাজ-পাট যা এসেছিল, তিন-পুরুষে-কলু ওর কর্মচাবী বেগতিক দেখে বেচে-কিনে দেশে প্রস্থান করেছে। তার আসা-যাওয়া গাড়ি ভাড়া, তিন মাসের বেতন ও ক্ষতিপূরণ —চাইতে পাবে বৈকি!

হযত কিছু বেশীই নিয়েছে সে কিন্তু সে হিসেব কে আর রাখল?

'না, এবার আর এস্টাব্লিসমেণ্ট ফেঁদে কারবার নয।' ঘোষণা করল পবিত্র, 'এবার যা করে আমার টো-টো কোম্পানী ভরসা।'

কোন এক বন্ধুকে ধরে জেলখানায খাদ্যবস্তু সববরাহের ঠিকা নিল অতঃপর।

এস্টাব্লিসমেণ্ট না হ'লেও কর্মচারী জনতিনেক রাখা দরকার হয়ে পড়ল।

কারণ বিচিত্র সব ফরমাস আসে, আর তার আসারও কোন সময় অসময় নেই। কোন 'এ' ক্লাস কয়েদী পরের দিন কৈ মাছ খাবেন—সেটা টেলিফোন যোগে বাত সাড়ে এগারোটাতেও জানানো চলে।

একমাসেই বিরক্ত হয়ে উঠল সে।

তা ছাড়া ছুটোছুটি ক'রে বাজার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ফলে সবটাই কর্মচারীদের ওপর ছেড়ে দিতে হ'ল।

যে কারবারে শতকরা তিনশ টাকা লাভ হবার কথা—সেই কারবারেই কোথা দিয়ে যে মাস মাস বিপুল ঘাটতি পড়তে লাগল তা পবিত্র কিছুতেই বুঝতে পারল না।

আর, তা ভাল ক'রে বোঝবার আগেই—বারবার সময়মতো

মাল সরবরাহ না হওয়ার অজুহাতে মধ্য পথেই ঠিকাটি বন্ধ হয়ে গেল—মায় জামানতের টাকাটিও গেল হজম হয়ে।

সেই ঠিকা অবশিষ্ট কমাসের জন্যে ওরই প্রাক্তন কর্মচারীরা নিয়ে তিন মাসে গাড়ি কিনে ফেলল একখানা।

পবিত্র বলল, 'ও সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি, সবাই কিনতে পারে।'

নীলিমা বলল, 'তুমি একখানা থার্ডহ্যাণ্ড গাড়িই কেনো দিকি! অবশ্য বন্ধুদের কাছ থেকে ধার না ক'রে!'

অনাবশ্যক বোধেই পবিত্র এ কথার কোন জবাব দেয় না।

নীলিমা শাশুড়ীকে বলে নি—ইদানীং বুঝেছে যে ছেলের কোন দোষটাকেই বড় ক'রে দেখতে চান না গিরিজায়া, শুধু শুধু সে দোষ দেখাতে গেলে সে-ই অপ্রিয় হবে—কিন্তু দৈবাৎ পবিত্রর একখানা পুরনো চিঠি হাতে পড়ে যেতে সে দেখেছিল ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বন্ধুর কাছ থেকে দু'শ একশ পাঁচশ হাজার ক'রে প্রায় ন-দশ হাজার টাকা ধার করেছে পবিত্র।

দেখে শিউরে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

অপমানের ভয়ে নয়। ছেলেকে দশ হাজার টাকা দিয়ে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা জয়দেবের আছে তা সে জানে। সে শিউরে উঠেছিল স্বামীর দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় পেয়ে।

॥ ৮ ॥

এরপর মাস খানেক বেশ নিটোল আলস্যে দিন কাটাল পবিত্র। বলল, 'একটু ব্যথাটা মেরে নিতে দাও দিনকতক। তাছাড়া টাকার ঘা-টাও তো বড় কম নয়। লোকে বলে অর্থশোক পুত্রশোকের বাড়া। একটা প্ল্যান-অফ-য়্যাক্‌শ্যানও এবার ঠিক করা দরকার। এবার আর কোন আজে-বাজে ব্যাপারে চট ক'রে নেমে পড়তে চাই না!'

গায়ের ব্যথাটা যে কিসেব—নীলিমা তা প্রশ্ন করে না।

কিছু না ক'রেই সম্ভবত।

ইদানীং আর এসব নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে বড় খারাপ লাগত নীলিমার। ঘৃণা—না, ঘৃণার চেয়েও বেশী।

সে যে ওর কী বকম একটা আত্মগ্লানি তা ও কাউকে বোঝাতে পারবে না। এক একদিনেব এক এক পর্বের পর মনে হ'ত—ও নিজেকেই বিষ দিয়ে মারছে একটু একটু ক'রে।

আসলে এ যে ওর আত্মহত্যাই।

স্বামী, যার সঙ্গে জীবন অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা, দিন-রাত্রি যে পাশে থাকবে, যার সাহচর্য এড়াবার উপায় নেই—এক সে নিজে থেকে সরে না গেলে, তাকেই যদি শ্রদ্ধা করতে না পারে, ভালবাসতে না পারে—তাহলে এ জীবনটা টেনে নিয়ে সে বেড়াবে কী ক'রে?

যত দিন যাচ্ছে ততই এই লোকটা সম্বন্ধে যে বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠছে ওর।

কী ক'রে এর সঙ্গে দীর্ঘ জীবন কাটাবে সে!

আলস্যের পর্বটা শেষ হ'তেই বড বেশী যেন সক্রিয় হয়ে উঠল পবিত্র।

ভোর হ'তেই কোথায় বেরিয়ে যায়—ফেরে কোনদিন ছুটো, কোনদিন আড়াইটেয়। আবার সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায়—রাত এগারোটা বেজে যায় ফিরতে।

গিরিজায়া উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

এমন করলে কদিন বাঁচবে ছেলে। এ পরিশ্রম কী মানুষের সহ্য হয়?

আসলে বধূর তিরস্কার ও অনুযোগেই যে সে এমন দিশেহারা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে—প্রচ্ছন্নভাবে এ অনুযোগও করেন নীলিমার কাছে। অর্থাৎ ওর শরীর যদি ভেঙে পড়ে তো সে জন্যে নীলিমাই দায়ী হবে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি স্বামীর কাছেও কথাটা পাড়েন মধ্যে মধ্যে। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু জয়দেব তাঁর পুথির বাইরেকার জগৎ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতে চান না কখনই। এটাও উড়িয়ে দেন। বলেন, 'জোয়ান ছেলে এখন খাটবে না? আর খাটলে কখনও ওদের শরীর খারাপ হয়! তাছাড়া নিজের জীবন যখন ও নিজেই গড়ে নেবার দায়িত্ব নিয়েছে—তখন ওর কাজের মধ্যে আর ওর জীবনের-মধ্যে আমাদের নাক না গলানোই ভাল!

কিন্তু নীলিমা এই ছুটোছুটিতেও আশ্বস্ত হ'তে পারে না।

আসলে মানুষটাকে ও চিনে নিয়েছে।

তার সঙ্গে এই সক্রিয়তার কোন মিল নেই।

কাজে ঘুরছে কি অকাজে ঘুরছে—কে জানে!

আজকাল জিজ্ঞাসা করতেও কেমন একটা অপমান বোধ হয় ওর।

আগে মিথ্যা কথাটা খুব সহজে বলতে পারত না পবিত্র—তাই এড়িয়ে যেত। এখন সহস্র মিথ্যা কথা বলে।

কেউ জিজ্ঞাসা না করলেও অকারণ কতকগুলো মিথ্যা কথা বলে।

আর সেগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যা বলে বোঝা যায়।

আনাড়ীর মিছে কথা—যাচাই-পরখ ক'রে দেখতে হয় না।

তবে একটা দিকে বেঁচে গিয়েছে সে।

ঐ সঙ্গ তাকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে হয় না।

দিনে তো নয়-ই—রাত্রেও পাশে শুয়ে কথা বলার যন্ত্রণা থেকে বেঁচেছে সে।

নীলিমা ঘুমিয়ে পডবার অনেক পরে বাড়ি ফেরে পবিত্র।

সব দিন ওব মধ্যেই যে ঘুম আসে তা নয—কিন্তু ঘুমের মতো ক'রেই পড়ে থাকে নীলিমা।

এ বিষয়ে গিবিজায়ারও অনুমতি দেওযা আছে, 'ও বোম্বেটে কখন বাড়ি ফিরবে তার কি কিছু ঠিক আছে মা। তুমি কতক্ষণ বসে থাকবে! তুমি শুয়ে পড়োগে। আর আমাকে তো থাকতেই হয়—মিছি-মিছি একজন লোকের জন্যে দু'জন জেগে বসে থেকে লাভ কি!'

এসে স্নান ক'রে খেয়ে যখন পবিত্র তার ঘরে পৌঁছয়—তখন বারোটা বেজে যায এক এক দিন।

ততরাত্রে ওর ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস করে না সে।

এমন কি পাশে শোয়ও না আজকাল।

একটা মাতুর পেতে বালিশ টেনে নিয়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ে।

পরের দিন সকালে তার জন্যেও কোন কৈফিয়ৎ চায় না নীলিমা।

কোন প্রকার প্রশ্রয় দিতে আর রাজী নয় সে।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন পবিত্র তার এক বন্ধুকে নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

নিখিল নাকি তার বহু কালের বন্ধু। গত ছ বছর বোম্বেতে ছিল, সম্প্রতি বদলি হয়ে আবার কলকাতাতে ফিরেছে। বড় এক

বিলিতী কোম্পানীতে কাজ করে। ওর বাবাও খুব বিখ্যাত উকিল এখানকার। অবস্থা ভাল। খুবই ভাল।

এসব তথ্য গিরিজায়াই দিলেন।

'পবু আমার বাঁচল—বুঝলে বৌমা। ওরা যে ছেলেবেলা থেকে হরিহর-আত্মা। এক গলায় জল ঢাললে দু-গলায় পড়ে। আসলে নিখিল আমার বোম্বাই চলে গিয়ে পর্যন্ত একটু মনমরা হয়ে ছিল পবু।'

ছেলের বিশেষ বন্ধু, গিরিজায়ারও স্নেহের পাত্র। বাড়ির ছেলের মতোই।

সুতরাং একেবারে অন্তঃপুরেই এনে হাজির করেছিল পবিত্র।

একেবারে নিজেদের ঘরে।

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নীলিমার সঙ্গে।

তখন আর হাসি-মুখে অভ্যর্থনা না ক'রে উপায় ছিল না।

সুশ্রী, সদা হাস্যমুখ, মধুর স্বভাবের ছেলে।

খুব খারাপ লাগে নি বললে ভুলই বলা হবে।

বরং ভালই লেগেছিল।

বিস্তর হাসি-তামাসা করেছিল নিখিল। বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপে বিব্রতই ক'রে তুলেছিল।

তবু খারাপ লাগে নি।

সে বিদ্রূপে ঝাঁজ নেই, তা গায়ে বেঁধে না। খোঁচাগুলোও মিষ্টি লাগে কেমন।

ভাল যেটা লাগে নি সেটা নিখিলের চোখ দুটো।

কী এক রকমের অস্বস্তিকর চাহনি।

তা যেন ওর সর্বাঙ্গ লেহন করতে থাকে—সমস্ত কথা-বার্তার ফাঁকে ফাঁকে।

তবু অনেক দিনের জমাট গুমোটের পর যেন দক্ষিণা হাওয়ার একটা ঝড় তুলে দিয়ে গেল সে।

সে হাওয়ায় ওদের মনের মেঘও খানিকটা কেটে গেল বৈকি!

তৃতীয় ব্যক্তির সামনে বাধ্য হয়ে কথা কইতে কইতে কখন সহজ হয়ে আসে ওরা—তা নীলিমা বুঝতেও পারে না।

তারপর থেকে নিখিল প্রায়ই আসে।

গিরিজায়ার কাছেই এসে বসে। গল্প-গুজব করে সেখানে বসেই। কোন দিন পবিত্র থাকে, কোন দিন থাকে না।

নীলিমার সঙ্গেও যা কিছু হাসি-ঠাট্টা করে শাশুড়ীর সামনে বসেই।

নিভৃত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করে না বিন্দুমাত্র।

সুতরাং প্রথম দিনকার অস্বস্তিটা কেটেই যায় আস্তে আস্তে।

একদিন কথায় কথায় নিখিল বলে, 'বৌদি, আমাদের দেশের বাড়িতে চলুন—বেড়িয়ে আসবেন।'

নীলিমা কোন জবাব দেবার আগেই গিরিজায়া বলে উঠলেন, 'সে তো বেশ ভাল কথাই রে। সত্যি, বৌমা সেই কবে এসে ঢুকেছে এই খাঁচায়—কোথাও একটা দিনের জন্যেও বেরোতে পারে নি। ওর এক হয়েছে হাজার মাইল দূরে বাপের বাড়ি, দু'দিন বাপের বাড়ি গিয়ে জিরিয়ে আসবে তারও উপায় নেই।'

সেই সমর্থনকেই নীলিমার সম্মতি বলে ধরে নিয়ে নিখিল একেবারে খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল।

'খুব ভাল হবে, সত্যি বলছি বৌদি। আপনি দিল্লীর লোক, চিরকাল শহরে শহরে ঘুরেছেন—আপনার তো খুবই ভাল লাগবে। বাংলার সেই নিভৃত পল্লীর শ্যাম শোভা দেখলে মুগ্ধ হয়ে যাবেন।'

'খুবই যে ভাল লাগবে তা না দেখেই বুঝতে পারছি ঠাকুরপো' স্মিত মুখে নীলিমা বলল, 'উল্লেখ মাত্রেই যা কাব্য বেরোচ্ছে আপনার মুখ দিয়ে! বাব্‌বা·· তা আপনাদের দেশটা কোথায়?'

'এই রাণাঘাটের কাছেই। মাইল-চারেক দূর হবে। নদীর ধারে ভারি চমৎকার জায়গা।...দেখলে আর ভুলতে পারবেন না!'

ঠিক সেই সময়ই—পবিত্র কোথা থেকে এসে পড়ল।

তার পক্ষে নিতান্তই অসময় এটা।

সবাই অবাক হয়ে গেল।

'কী রে, তুই এমন সময়ে যে? অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?'

গিরিজায়া উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

'না না। এ পাড়ায় এসে পড়েছিলুম—তাই ভাবলুম এক গ্লাস জল খেয়ে যাই।...তা কিসের কথা হচ্ছিল নিখিল—কী ভুলতে পারবে না যেন?'

গিরিজায়াই এবার জবাব দেন!

'ওদের দেশের কথা হচ্ছিল। নিখিলদের দেশ। সে নাকি দেখলে ভুলতে পারবি না তোরা!'

সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন গিরিজায়া।

'তা দেখছি কী ক'রে? সিনেমায়? ডকুমেন্টারী উঠেছে নাকি?'

'না মশাই, না। আপনার পরিবারকে সবিনয়ে করজোড়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অধীনদের দেশে একবার পদার্পণ করার জন্যে!'

'ফাইন! ফাইন! দ্যাট্স্ এক্সেলেন্ট! কিন্তু সে কি ওঁর একলার আমন্ত্রণ?'

'না না। তুমিও যেতে পারো—ওঁর পার্সোনাল য়্যাটেণ্ডেণ্ট হিসাবে!

'এগেন ফাইন! সুপার্ব। দ্যাট উইল সুট মি বেস্ট্!'

যেন লাফিয়ে ওঠে পবিত্র।

'আমি এর মধ্যে পরমপিতা পরমেশ্বরের হাত দেখতে পাচ্ছি। আমাকে যেতেই হবে ওদিকে—দ্য সুনার দ্য বেটার।'

'কেন, ওদিকে যেতে হবে কেন?'

'ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটা রাস্তা মেরামত হবে ওদিকে।

কন্‌ট্র্যাক্টের চেষ্টায় আছি। একবার জায়গাটা সরেজমিন্ দেখে আসা উচিত নয়?'

'ব্যাস, তাহলে তো হয়েই গেল। সামনের সপ্তাহে সোমবারটা ছুটি পড়ছে—এই শনিবারেই যদি সকাল ক'রে বেরিয়ে যাওয়া যায় তাহ'লে পুরো দুটো দিন কাটাতে পারব। একেবারে মঙ্গলবার সকালের গাড়িতে ফেরা যাবে—কেমন? তা'হলে ঐ কথাই ঠিক রইল?'

যাকে উপলক্ষ্য ক'রে এই নিমন্ত্রণ, সেই নীলিমা কোন কথা বলার আগেই—বা তার মতামত জানানোর আগেই—সব ঠিক হয়ে গেল।

নীলিমা তার মতামত জানাবার কোন সুযোগই পেল না।

আর এমন ভাবেই, যেন সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে, ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেল যে তার পরে জোর ক'রে নিজের অমতটা জানাতেও পারল না।

কেমন একটা সঙ্কোচে বাধল।

॥ ৯ ॥

তবু ক্ষীণ একটু আপত্তি জানাতে গিয়েছিল নীলিমা স্বামীর কাছে।

সেদিন দৈবাৎ পবিত্র একটু সকাল সকাল ফিরেছিল—মানে নীলিমার শুতে যাবার প্রায় সময় সময়।

সে যখন স্নান ক'রে এসে কাপড় ছাড়ছে তখন একরকম মরীয়া হয়েই কথাটা বলে ফেলেছিল নীলিমা।

'নিখিল ঠাকুরপোর ওখানে তুমিই যেও—আমি আর যাবো না।'

'কেন ? যাবে না কেন ?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল পবিত্র।

চমকে উঠেছিল যেন কথাটা শুনে।

নীলিমার মনে হ'ল যেন একটু বেশীই চমকে উঠল সে।

অকারণে।

কাপড় পরাও ভুলে গেল কিছু কালের মতো।

'কেন—কী হ'ল কি এর মধ্যে আবার ?'

আবারও প্রশ্ন করে সে।

'না, কিছু হয় নি।...এম্‌নি।' খাটের একটা বাজুর কোণ্ খুঁটতে খুঁটতে বলে নীলিমা, 'কী, চেনা নেই শুনো নেই হঠাৎ ছুট্ ক'রে একজনদের বাড়ি উপস্থিত হবো! সে বড় লজ্জা করে। তাছাড়া পাড়া গাঁয়ের লোক সব কেমন হয় শুনেছি—সে আরও বিপদ।'

'আরে, সেখানে পাচ্ছ কাকে ? কেউ আসবে না তোমার ত্রি-সীমানায়—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। সে নিখিল ঠিক ক'রে দেবে সবাইকে। আরে, ওরাই হ' ও গাঁয়ের জমিদার—সবাই ভয় ক'রে চলে ওদের পাড়ায়, কাউকে ঘেঁষতে দিলে তো নিখিল!'

'পাড়ার কেউ না ঘেঁষুক—বাড়ির লোকজন তো আছে।

'বাড়ির লোকজন পাচ্ছ কোথায় আবার! সব তো এখানে। সে বাড়ি খালি। ও হরি···তুমি বুঝি এই সব ভাবছ বসে বসে!'

হঠাৎ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার মতো উৎফুল্ল দেখায় পবিত্রকে।

সে যতটা আশঙ্কা করেছিল ব্যাপারটা যেন তার থেকে অনেক কম গুরুতর।

'খালি বাড়ি কী রকম। ওঁর বাবা মা নেই?

'রামচন্দ্র! তাঁরা তো কলকাতায় থাকেন। বাবা মা ওঁর পিসীমা সবাই। আর ও তো এক ছেলে বাপের, বুঝতেই পাবছ, ভাই-বোনেরও বালাই নেই!

'ওমা তাহ'লে আমি যাব কী ক'রে। একা—শুধু ওঁর সঙ্গে—ছি! সে বড বিশ্রী।'

পবিত্র যেন একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে এবাব।

'না, মানে—ওর বাবা মা নিশ্চয়ই যাবেন।···সে কী না গিয়ে পারেন, হাজার হোক তাঁদের বাডিতেই আমরা গেস্ট্ যাচ্ছি। তা তবে তাঁবা সে রকম নন। আর তাঁরা তো কলকাতাব লোক গো। পাডার্গাঁয়েব লোক বলে তোমার যে ভয় সে তো আর তাঁদের বেলা খাটে না। দেখবে দু'মিনিটে তোমাকে আপন ক'রে নেবেন।'

'ঠিক যাবেন তো—না আমবা গিয়ে পডে বেকুব হবো।'

'না না। সে তো ওঁবা শনিবার ভোবেই চলে যাবেন, ওঁদের তো হাইকোর্ট শনিবার বন্ধ থাকে। ফি শনিবাবেই উনি চলে যান। বাগান টাগান—কত কি রয়েছে, ওঁদেব না গেলে কী চলে।'

নীলিমার তবুও মনে হ'ল কোথায় যেন কী একটা বড় রকমের গোলমাল থেকে যাচ্ছে।

কিন্তু সেটা ঠিক স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝতেও পারল না।

সুতরাং প্রবল আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেল না।

শনিবার দুপুর পেরোবার অনেক আগেই গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিল নিখিল।

'চলুন বৌদি। এ কি পবু তুই গড়াচ্ছিস এখনও? রেডি হোস নি? দুটোয় গাড়ি যে!'

'দুটোর গাড়িতে যাবি নাকি? এই ঠিক-দুপুরে? এত রোদে?'

'তা নইলে আর গাড়ি কোথায় বল? এইটেই লালগোলার গাড়ি, গ্যালপিং ট্রেণ—এর পরের গাড়িগুলোয় যেমন ভিড় হবে তেমনি যাবেও সেগুলো টিকুতে টিকুতে—সে ভারী বদারেশন। তাছাড়া একটু সকাল ক'রে না গেলে ওধারে গো-গাড়িতে যাওয়া—সন্ধ্যে পেরিয়ে যাবে যে। ঐ হাঙ্গামার জন্যেই তো—নইলে গাড়ি নিয়ে যাবার রাস্তা থাকলে কি আর বৌদিকে এত কষ্ট দিই। হাজার হোক রাজধানীব মেয়ে—ওঁদের মর্যাদা কত। আমাদের দেশের মতো বনগাঁয়ে ওঁদের নিয়ে যেতে চাওয়াই তো এক নম্বর ধৃষ্টতা আমাদের।'

'কিন্তু তা তো হ'ল—এ দিকে দেড়টা বাজে যে। মাই গড্! কিছু বলেও যাস নি আগে। ওগো নাও গো—তাড়াতাড়ি। আর পঁয়ত্রিশ মিনিট মোটে সময়। চল্, আমরা ও ঘরে গিয়ে বসি—চটপট সেরে নিক ও—'

পবিত্র নিখিলকে টেনে নিয়ে চলে যায়।

সুতরাং তখনও কোন কথা কওয়া যায় নি।

কওয়ার প্রয়োজন আছে তাও তত বোঝে নি নীলিমা।

এদিক দিয়ে কোন সন্দেহই হয় নি।

ট্রেণেও—যদিও ফার্স্ট ক্লাসেরই টিকিট কেটেছিল নিখিল—এত ভিড় হয়েছিল যে সামান্য দু-একটা কথা ছাড়া কোন রকম অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগই মেলে নি।

নীলিমার মনটা কিন্তু মোটামুটি খুশীই ছিল।

সত্যিই সে বহুকাল বেরোতে পারে নি কোথাও।

ট্রেণে চড়তে পারাটাই যেন সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে আজ।

দু একদিন এদিক ওদিক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া, এবং মোট আট দশ দিন সিনেমায় যাওয়া—এ ছাড়া এই দীর্ঘকালের মধ্যে বাড়ি ছেড়েই কোথাও বেরোয় নি সে।

ট্রেণের ধোঁয়া এবং কয়লার গন্ধও যেন কি মিষ্টি লাগছে তার কাছে!

তার ওপর রাণাঘাট স্টেশনে নেমে সাইকেল রিক্সা ক'রে খানিকটা গিয়ে আবার গোরুর গাড়িতে চড়া—সবই তার কাছে অভিনব বলে বোধ হ'তে লাগল।

বিশেষ ক'রে এই গোরুর গাড়ি চড়াটা।

কখনও কাউকে যে চড়তে দেখে নি তা নয়। কিন্তু নিজে যে কোন দিন চড়বে—এ ছিল ওর কল্পনার বাইরে।

সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

অবশ্য নিখিল শাসিয়ে দিয়েছিল আগেই, 'এবার হাড়গোড় দু-চারখানা ভাঙ্গবার জন্য প্রস্তুত হোন বৌদি!'

কিন্তু সে যে এতটা সত্য—গোরুর গাড়িতে চড়ে যাওয়াটা যে ঠিক এই পরিমাণ ভয়ঙ্কর—তা আগে বোঝে নি নীলিমা।

এক একটা আলে যখন উঠছে কি সরাসরি নামছে—কিম্বা বহু গোরুর গাড়ি যাওয়ার ফলে রাস্তার মাঝখানে তৈরী হয়ে ওঠা খানাখন্দে পড়ছে—তখন যে ধাক্কা লাগছিল ওদের সে ধাক্কার কথা কোন বই পড়ে বা লোকের মুখে শুনে অনুভব করা যায় না।

তাই তার জন্য প্রস্তুতও ছিল না।

কিন্তু দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে মানসিক অস্বস্তিটাই পীড়া দিচ্ছিল ওকে বেশী।

একটা গাড়িতে গাড়োয়ান ছাড়াও ওরা তিনজনে উঠেছিল।

অবশ্য সেটা নাকি খুব একটা অঘটনও নয়।

গাড়োয়ান ও নিখিল দুজনেই জানাল ওকে যে, এটা মোষের গাড়ি, গোরুর গাড়ির চেয়ে অনেক বড় এটা।

মোষের গাড়িতে তিনজন তো চড়েই—চারজনও বেশ অনায়াসে চড়তে পারে। তাছাড়াও ট্যামরা-টুমরি—অর্থাৎ ছেলে মেয়ে থাকে দুটো চারটে ক'রে।

'বিশ পঁচিশ মণ মাল বয় তো গো ঠাকুরুন। একটা মানুষের আর কত ওজন ধর না গিয়ে!'

নীলিমাকে বুঝিয়ে দেয় গাড়োয়ান।

কিন্তু তবু নীলিমার একটু সঙ্কীর্ণ ই মনে হয় পরিবেশটা।

নিকট আত্মীয় হলে অতটা অসুবিধা হ'ত না। কিন্তু এ পরের সঙ্গে—।

হাওয়া পাবে ও দেখতে দেখতে যাবে বলে নীলিমাকে পিছন দিকে ধারে বসানো হয়েছিল। মাঝখানে ছিল নিখিল। গাড়োয়ানের কাছে পবিত্র।

সুতরাং যখনই প্রবল ধাক্কা আসছিল, পূর্ব পরিকল্পিত সতর্কতা সত্ত্বেও সে প্রতিবারেই নিখিলের গায়ের ওপর এসে পড়ছিল। আর নিখিলও—পাছে নীলিমা ওদিকে ছিটকে পড়ে যায় সেই জন্য—হাত দিয়ে বেড়ে ধরছিল ওকে।

অর্থাৎ এক কথায় আলিঙ্গনের মতো একটা অবস্থা ঘটছিল প্রায় প্রত্যেক বারই।

ভারী লজ্জা করছিল নীলিমার।

অথচ কথাটা মুখ ফুটে বলাও যায় না ঠিক।

স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না যে, শুধু এই কারণেই বসবার ব্যবস্থাটা বদলানো দরকার।

কারণ নিখিলের তরফ থেকে এতটুকু অশোভন ধৃষ্টতার চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছিল না।

যা ঘটছিল সবই আকস্মিক এবং তার তরফ থেকে কোন চেষ্টা

ব্যতিরেকেই। তা ছাড়া নিখিলের বাহুবেষ্টনীকে আর যাই হোক বাহুবন্ধন বলেও ঠিক অভিহিত করা যায় না।

তবু একবার সসঙ্কোচে বলতে গেল সে, 'তুমি এদিকটা এসে বসলে না কেন—নিখিল ঠাকুরপোব একটু অসুবিধে হচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হচ্ছে আমাব জন্যে!'

নিখিল অবশ্য হাঁ-হাঁ ক'বে উঠল।

'কিছু না, কিছু না। আমার কোন অসুবিধা নেই!'

পবিত্রও উড়িযে দিল কথাটা, 'না না, ও কিছু নয়। ওতে নিখিল কিছু মনে করবে না। তা ছাড়া হাজার হোক্ তোমার মতো এক নারীব সাহচর্য—জোব ক'রে দৈবক্রমে ছাড়া ওর তো আর অদৃষ্টে জুটবে না। এই ফাঁকতালে যেটুকু জোটে। কী বল হে নিখিল!'

হো-হো ক'রে হেসে ওঠে সে।

নীলিমাব কান দুটো পর্যন্ত লজ্জায় জ্বালা কবে ওঠে।

নিখিলও মাথা নামায়।

নিখিলদের বাড়িতে যখন গিয়ে গাড়ি থামল তখন ঘোর-ঘোর সন্ধ্যা।

কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে অবাক হয়ে গেল নীলিমা।

এমন কিছু প্রাসাদের মতো বাড়ী নয় সত্য কথা—কিন্তু খুব একটা ছোটও নয়।

তবু সে বাড়িও, আগাগোড়া অন্ধকার, থম-থম করছে।

কোন জনমানবের চিহ্ন নেই যেন।

নিখিল গিয়ে 'কেষ্ট' 'কেষ্ট' ক'রে ডাকতে একটি খর্বাকৃতি শ্যামবর্ণ মধ্যবয়সী চাকর লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল বটে—কিন্তু সেই অন্ধকার বাগানে অন্ধকার প্রেতপুরীর মতো বাড়ির পৃষ্ঠপটে তাকেও ঠিক মানুষ বলে মনে হ'ল না যেন।

কেমন একটা গা ছম-ছম ক'রে উঠল নীলিমার।

সে তাড়াতাড়ি নিখিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'বাড়ি এমন অন্ধকার কেন? কোন ঘরে আলো জ্বলছে না।'

'কেউ নেই বলেই জ্বলছে না। এই তো আমরা এলুম, এই বার জ্বলবে।'

'কিন্তু—আর কেউ নেই?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে নীলিমা।

আরও বিস্মিত হয় নিখিল, 'আর কে থাকবে?'

'আপনার বাবা মা?'

'তাঁরা তো কলকাতায়।'

'আসেন নি আজ তাঁরা?'

'না, এলে তো আমাদের সঙ্গেই আসতেন। তাঁদের আসাই হয় না বিশেষ। এলে যা আমিই আসি মধ্যে মধ্যে, উইক-এণ্ড করতে। বন্দুকটা আছে, শিকারের শখও আছে—তাই। তাঁরা কী করতে আসবেন? বাবার একদিন কলকাতা ছেড়ে আসা মানে অন্তত শখানেক টাকা লোকসান, আর মা তো বাতে পঙ্গু—তাঁর পক্ষে নড়াই মুস্কিল!

'তবে যে, তবে যে—' নীলিমা যেন থতমত খেয়ে যায় একটু, 'তবে যে উনি বললেন, তাঁরা ফি সপ্তাহেই আসেন, হাইকোর্ট শনিবার বন্ধ থাকে বলে ওঁরা ভোরের ট্রেণে চলে আসেন!'

'বলেছে নাকি এই কথা?...কেন ও তো ভাল রকমই জানে—বাবা মা বছরে একদিনও আসেন কিনা সন্দেহ। এই, এই রাস্কেল্, কী বলেছিস বৌদিকে তুই?'

পবিত্র এতক্ষণ কেষ্টর সঙ্গে আলো ধরে গাড়ি থেকে ওদের স্যুটকেসটা নামাবার তদ্বির করছিল, সে এবার কাছে এসে দাঁত বার ক'রে বলল, 'তুইও যেমন, না বললে আসত নাকি? তোর বৌদি একেবারে যাকে বলে 'স্বাধীনতা-নিবারণী সঙ্ঘে'র প্রেসিডেণ্ট!'

রাগে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি ক'রে উঠল নীলিমার।

সে ওদের সঙ্গে আর একটা কথাও না কয়ে কেষ্টর পিছু পিছু বাড়ির পথ ধরল।

'কেন বলতে' গেলি ওসব তুই মিছিমিছি!' একটু বিরক্ত ভাবেই বলে নিখিল, 'উনি হয়ত ভাবলেন যে আমারও এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে। ওঁর এত আপত্তি আছে যখন তখন না আনলেই হ'ত —কি অন্য ব্যবস্থাও করতে পারতাম!'

'নে নে। ও নিয়ে আব এখন মাথা ঘামিযে লাভ নেই। এ রোষ রবে না চিরদিন—মনে নেই, রাজা ও বাণীর সেই অমর শেষ লাইনটা?'

চাকরকে আগে থাকতে খবর পাঠানো ছিল—সুতরাং আতিথেয়তার কোন ত্রুটিই হ'ল না।

চা জলখাবার—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত হয়ে গেল।

কেষ্টর মুখে যা শুনতে পেল নীলিমা—আজ সকালের গাড়িতে লোক দিয়ে নিখিল বাজার, মাংস, ঘি ময়দা, ফল মিষ্টি চা সব পাঠিয়েছে। আয়োজনে কোথাও কোন খুঁৎ নেই।

নিখিলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও চা খাওয়া শেষ হ'তে কাপড় বদলে নীলিমা কেষ্টর সঙ্গে তার রান্নাঘরে এসে পৌঁছল। এবং জোর ক'রে অর্ধসমাপ্ত রান্নার ভার নিজের হাতে তুলে নিল।

বলল, 'হ্যাঁ, আমি বসে বসে গল্প করব আর হাই তুলব—আর ঐ বেটাছেলে চাকর রান্না করবে। সে হয় না—ও গল্পে আর আমি কী যোগ দেব বলুন, ও আপনাদেরই ভাল। আমি এ দিকটা দেখি গে।'

কেষ্টও বাধা দিয়েছিল প্রথমটা কিন্তু নীলিমা তাকে এক কথায় থামিয়ে দিল। বলল, 'ওমা, আমিই বা তোমার হাতে খাব কেন—আমি হলুম পণ্ডিত-ঘরের বৌ। বাড়িতে ঠাকুর আছেন। ওরা বেটেছেলে যা করে করুক—আমি কি পারি?'

এ যুক্তি কেষ্টর পক্ষে বোঝা সহজ।

সে খুশী হয়ে হেঁশেল ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল।

ওর কাছ থেকে জেরা ক'রে অনেক জিনিস জেনে নিল নীলিমা।

কেষ্ট একাই থাকে এখানে। এই গ্রামেই ওর বাড়ি। বাবুরা না থাকলে তার বৌ এসে থাকে এখানে। আজ সকালে সে পালিয়েছে। তার বড় লজ্জা। তবে কাল এক ফাঁকে ভোরে এসে বাসন-টাসন মেজে দিয়ে যাবে।

না, বাবু মা কখনও আসেন না। সেই বছর দুই আগে সেটেলমেণ্টের সময় বাবু একবার এসেছিলেন। সঙ্গে মা তো ছিলেনই—আরও কে কে সব ছিলেন। ঠাকুর চাকর, সে এলাহি ব্যাপার।

আসতে শুধু দাদাবাবুই আসেন—হৈ হ'ল্লা করেন, শিকার করেন চলে যান। তাও খুব ঘন-ঘন নয়। নমাসে ছ'মাসে।

বাড়ি ভাল তা বলে। বছর বছর মেরামত করায় বাবু। বাসন-কোসন বিছানা সব আছে। বেশী নয়—দু-তিন জন এলে চালিয়ে নেবার মতো সব আছে। বাবু এলে সঙ্গে সব জিনিস আসে। এসব দাদাবাবুর মতো থাকে, কাল সকালে কেষ্ট বাড়ি-ঘর সব দেখাবে বৌদিকে।

'তা চুরি হয় না—হ্যাঁ কেষ্ট, কী ডাকাতি ?'

'আজ্ঞে তা আপনার আশীব্বাদে এখনও পজ্জন্ত তো হয় নি। ডাকাতির মতো মাল তো কিছু থাকে না এখানে—চুরি, তা হ্যাঁ চুরি হতে পারে বটে। তবে কী জানেন বৌদি, চৌকীদার বড়বাবুর কাছে মাসে মাসে আলাদা মাইনে খায়—গাঁ পাহারা দিক না দিক—এ বাড়ি রাতের মধ্যে অন্তত তিন বার দেখে যায়!'

খাওয়া দাওয়ার পর শোওয়ার ব্যবস্থা।

নীলিমা যখন পরিবেশন ক'রে খাওয়াচ্ছিল তখনই কেষ্ট ওপরের ঘরে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে রেখে এসেছে।

দোতলার পাশাপাশি দুটি ঘরে দু'টি বিছানা পড়েছে।

একটি বড় ডবল খাটে—পবিত্র ও নীলিমার।

আর একটি ছোট তক্তপোশে—নিখিলের।

ওরা দু'বন্ধু খেয়ে ওপরে চলে এসেছিল—নীলিমা বসে কেষ্টকে খাওয়াচ্ছিল।

নীলিমা যখন ওপরে এল তখন ওরা দু'জনেই নিখিলের বিছানায় বসে গল্প করছে।

ও এসে দাঁড়াতেই নিখিল বলল, 'ঐখান থেকে জলটা একটু দেবেন বৌদি?'

একটা বড় ঘটিতে ক'রে টেবিলের ওপর জল রেখে গেছে কেষ্ট।

কিন্তু গেলাস নেই।

'গেলাস দেখছি না যে! দাঁডান একটা নিয়ে আসি।'

'না না—আপনাকে আর অন্ধকারে একশো বার ওপর-নিচে করতে হবে না। ঘটিটাই দিন, আলগোছে বেশ খেতে পারব খন—'

'সে কি হয়। ঐ ঘটি ধরে—দাঁড়ান, যাব আর আসব।'

কিন্তু সে কোথাও যাবার আগেই এক কাণ্ড ঘটে যায়।

নীলিমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার সব চেয়ে সোজা উপায় হিসাবে নিখিল নিজেই হাত বাড়িয়ে ঘটিটা টেনে নেয় টেবিল থেকে। আর ঠিক সেই একই সময় পবিত্র নীলিমাকে আটকাবে বলে উঠতে চেষ্টা করে—ফলে দু' জনের ধাক্কা লেগে সম্পূর্ণ ঘটিটা উল্‌টে যায় নিখিলের বিছানার ওপর।

'যা! কী হ'ল!'

দু'জনেই ব্যস্ত হয়ে জলটা ঝাড়বার চেষ্টা করল—কিন্তু আনাড়ির চেষ্টায় জলটা আরও লেপে গেল সমস্ত তোশকে।

'এখন উপায়?' পবিত্র প্রশ্ন করে।

'উপায় আর কি'— অপ্রতিভ ভাবে হাসে নিখিল, 'দেখি মাদুর-টাদুর একটা জোগাড় হয় কি না?'

'কেন, বিছানা আর নেই?' নীলিমা প্রশ্ন করে।

'না। বিশেষ তো কেউ আসে না এখানে। আমিই আসি—বড় জোর এক-আধজন বন্ধু। কাজেই অত বিছানা কেন থাকবে বলুন? শুধু শুধু নষ্ট হয় বৈ তো নয়।'

তারপরই এদের তাড়া দেয়।

'যান যান শুয়ে পড়ুন গে। অনেক রাত হয়ে গেল।'

'আপনি ?'

'আমার যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। ও মেঝেয় শোওয়াও আমাব অভ্যাস আছে—'

নীলিমা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

'তা কখনও হয়। কেন, এই বিছানা থেকে কিছু কিছু বার ক'রে দিই না— ?'

'কী দেবেন ? একটা গদী আর একটা তোশক। দিতে গেলে ছুরি দিযে কেটে দিতে হয় খানিকটা।'

'তবে দেখি না কেষ্টর স্টকে কিছু আছে কিনা—'

নীলিমা নিচে নামতে উদ্যত হয।

তাব আগেই পথ আগলে দাঁড়ায় নিখিল।

'পাগল হযেছেন আপনি। কেষ্টর স্টকে কি আছে আমি জানি না ? ওর সেই ময়লা কাঁথা আব ছেঁড়া মাদুব। ও আমার যা হয় হবে—আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

এবার পবিত্রর মাথায় একটা বুদ্ধি আসে।

'আহা-হা, অত কাণ্ডর দরকাব কি ? এই তো এত বড় বিছানা এ ঘরে—এর মধ্যেই তিনজন ধবে যাবে।'

'যা ! এক বিছানায়—তোর যা বুদ্ধি।'

'কেন আমি স্বামী রয়েছি সঙ্গে তাতেও দোষ ? বেশ তো, আমি মাঝখানে শুচ্ছি, তুই একপাশে আর ও একপাশে শুক। তাহলেই তো হ'ল ? একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে শোবে এখন নীলিমা—'

নিখিল প্রতিবাদ করে তবুও।

কিন্তু পবিত্র কোন কথাই শোনে না। জোর ক'রে ওদের ভেতরে এনে দোর বন্ধ ক'রে দেয়।

নীলিমাও কিছু বলবার অবসর পায় না।

ক্রোধে ও বিরক্তিতে গলা পর্যন্ত উপ্‌চে আসে—তবু কিছু বলা হয় না।

তবে একটা সুবিধা—মনে মনে সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় সে—আজকে এই নিভৃত ঘরে পবিত্রর সঙ্গে শোওয়ার কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকে রক্ষা করলেন তিনি।

ঐ মিথ্যাবাদী ইতরটার সঙ্গে কী কথা কইত সে।

কেমন ক'রে নিজেকে সংযত রাখত!

এতক্ষণ ধরে সেইটেই ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না যেন।

ওর পাশে শুতেও অপরিসীম ঘৃণা বোধ হচ্ছিল তার।

বহুরাত্রি পর্যন্ত ঘুম এল না নীলিমার।

প্রথমত একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, অপরিচিত ঘরবাড়ি।

নতুন পরিবেশই শুধু নয়—নতুন পরিস্থিতি, বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

স্বল্পপরিচিত পরপুরুষের এক হাতের মধ্যেই শোওয়া—একই বিছানাতে, একই মশারীর মধ্যে।

মধ্যে স্বামী আছে বটে—তা সেও আজ ওর কাছে তার বন্ধুর চেয়ে খুব বেশী আপন নয়। পরস্যাপি পর।

পরের চেয়েও খারাপ অনুভূতি হচ্ছে ওর—ঐ লোকটার পাশে শুয়ে।

পরের পাশে শুলে অস্বস্তি হয়, লজ্জা বোধ করে—তবু এমন গ্লানি বোধ হয় না। এত অসহ্য নয় তার সাহচর্য।—

ঘুম হয় না—তবু শাড়ীটাকে যৎপরোনাস্তি জড়িয়ে কাঠের মতো পড়ে থাকে সে।

পবিত্র যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা তার দিকে না চেয়েও বুঝতে পারা যাচ্ছে—তার নিঃশ্বাসের শব্দে।

সম্ভবত নিখিলও।

সে-ই শুধু অন্ধকার অপরিচিত ঘরে অপরিচিত শয্যায় শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবছে আকাশপাতাল।

অক্টোপাশের বন্ধন কী জিনিস তা সে জানে না, তবু অনেক জায়গায় পড়েছে কথাটা। আজ ওর মনে হচ্ছে তেমনিই একটা অদৃশ্য বন্ধনে চারিদিক থেকে চাপ দিচ্ছে, নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসছে ওর।

কোন দিন কি এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে সে ?

পাওয়া কি সম্ভব ?

ভাবতে ভাবতে ওর শ্বশুরের কথা মনে পড়ে যায়।

আপন-ভোলা দেবতুল্য লোক, মা-জননী ছাড়া কথা বলেন না।

সেই লোকের এই ছেলে ? আশ্চর্য !

জেগে থাকবার কারণ যতই থাক, ঘুমিয়ে পড়বার কারণ আরও বেশী ছিল।

দুপুরে বিশ্রাম হয় নি।

এতটা পথ ট্রেণে আসা। এখানে এসেও বসে নি একটুও।

তাছাড়া, মানসিক উত্তেজনারও প্রতিক্রিয়া আছে একটা। সে প্রতিক্রিয়া স্নায়ুতে অবসাদ আনে।

সর্বোপরি বয়স কম। স্বাস্থ্য ভাল। একটু বিশ্রামের অবসর পেলেই তন্দ্রায় শিথিল হয়ে আসে দেহ।

তাই জেগে থাকবার কারণ ও খানিকটা ইচ্ছা সত্ত্বেও, একসময় শেষ রাত্রির দিকে ঘুমিয়েই পড়ে নীলির্মা।

তাই যা দেখছে সেটা যে স্বপ্ন তা বুঝতে পারে না।

সমস্ত স্নায়ু শিথিল করা তন্দ্রার অবসরে মন তার প্রিয় স্থানটিতে চলে গিয়েছিল—সুখদিনের স্মৃতিতে।

পবিত্রর সাহচর্য যখন শ্রেয় মনে হ'ত—সেই সময়কার।

সদ্য-বিবাহিত জীবনের একটি পরমাশ্চর্য রাত্রি।

পবিত্র কী একটা পরিহাস করেছিল, রাগ ক'রে ওপাশ ফিরে শুয়েছে নীলিমা। অনুতপ্ত পবিত্র ওকে সেদিক থেকে নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করছে। মুখে তার ক্ষমা প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জন—

নিবিড় বাহুবন্ধন।

ইচ্ছাও অনুকূল।

ওদিক থেকে এসে পবিত্রর বুকের ওপরই প্রায় পড়ে।

পবিত্র তাকে আরও জোরে বুকে চেপে ধরে। আরও জোরে। আরও নিবিড়ভাবে।

এবং তন্দ্রার ঘোরে মনে হয় উপর্যুপরি উত্তপ্ত, উন্মত্ত চুম্বনে নিপীড়িত করতে থাকে তার ওষ্ঠ দুটি।

সে চুম্বনের আবেগে যেন হাঁপ ধরে।...

আর সেই নিপীড়নেই ঘুম ভেঙ্গে যায়!

ঘুম ভাঙ্গে, তবু অতৃপ্ত স্বল্পস্থায়ী নিদ্রার বিহ্বলতা কাটে না।

তারই মধ্যে অসংখ্য চুম্বন বর্ষিত হ'তে থাকে তার ওপর—ভাল ক'রে একটা নিঃশ্বাস নেবারও অবসর না দিয়ে।

হাঁপিয়ে ছট-ফট ক'রে উঠে, সে বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে চেষ্টা করে।

তখনই মনে পড়ে যায় যে এটা সে দিন বা সে রাত্রি নয়। সে স্বামীও আর নেই তার। এ আলিঙ্গন ও চুম্বনে আনন্দ নেই—আছে লজ্জা, আছে অপমান, আছে এক প্রকারের ক্লেদাক্ত গ্লানি।

আর সেই সঙ্গে চোখে আলোটাও এসে পড়ে।

ঘুমের জড়তা কেটে যায় এক নিমেষে।

কিন্তু এ কি—এ কার বুকের মধ্যে এসে পড়েছিল সে?

তার স্বামী—পবিত্র কোথায়?

এ তো নিখিল!...

সে এক ঝট্‌কায় একেবারে বিছানা থেকে নেমে এসে মেঝেয় দাঁড়ায়।

মশারীর একটা কোণ ছিঁড়ে যায় ওর বেরিয়ে আসবার সময় টান লেগে। সেটা অদ্ভুত ভাবে ঝুলতে থাকে, মেঝের ওপর এসে প'ড়ে।

'এ কী! এ কী করছেন আপনি। ছি-ছি, কী পেয়েছেন আমাকে?...বিশ্বাস ক'রে এসেছি বলে—বিশ্বাস ক'রে এক বিছানায় শুয়েছি বলে—ছি ছি ছি!'

বেশী কথা বলতেও পারে না নীলিমা! আবেগে উত্তেজনায় উষ্মায় গলা বুজে আসে তার।

এক রকম ছুটেই ভেতরের দালানে এসে দাঁড়ায়।

পবিত্র, পবিত্র কোথায়!

এর কৈফিয়ৎ চাইবে সে। এই দণ্ডেই চলে যাবে এখান থেকে।

কিন্তু নিচে বাগানে যতদূর দৃষ্টি চলে পবিত্র কোথাও নেই।

কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গিয়েছে সে—নীলিমাকে না জানিয়ে।

একেবারে যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে।

আর সেই সুযোগ নিয়ে নিখিল—

ছি ছি ছি! সমস্ত গাল ঠোঁট দুটো যেন লঙ্কাবাটা-লাগার মতো জ্বলছে, তার সমস্ত গায়ে বিষের জ্বালা—

সে ছুটেই নেমে আসে নিচে।

'কেষ্ট, তোমার—তোমার সে দাদাবাবু কোথায় গেল বলতে পারো!'

'হ্যাঁ বৌদি—তিনি মাছ ধরতে গেছে নদীতে—হাতছিপ নিয়ে। বলে গেছে যে আজ সকালে মাছ চাই তো—তা সে মাছ তিনি ধরেই নিয়ে আসবেন!'

নদী খুব দূর নয়। বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যত দূর দৃষ্টি চলে, ঘাড় উঁচু ক'রে দেখল নীলিমা। পবিত্রর চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কিন্তু সে-ও আর তখন দাঁড়াতে পারছিল না।

তার সর্বাঙ্গের সেই জ্বালাটা অস্থির ক'রে তুলেছে তাকে।

ছেলেবেলায় একবার বিছে কামড়েছিল তাকে—নয়াদিল্লীর নতুন কোয়ার্টারে এসে—সেই রকম জ্বালা অনুভব করছে সে।

সে ছুটে গিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

সেখান থেকেই ডেকে বলে, 'কেষ্ট ওপর থেকে আমার স্যুট্-কেস্‌টা নামিয়ে এনে রেখো তো।

তারপর মুখ ধুতে থাকে। বার বার ঘষে ঘষে সাবান দিয়ে মুখ ধোয় সে। গাল ঠোঁট—সব।

হুড় হুড় ক'রে জল ঢালে গায়ে মাথায়।

মাথায় যে তেল দেওয়া হয় নি—তাও খেয়াল থাকে না।

নেহাৎ টবে তোলা জল—এক সময় শেষ হয়ে আসে—তাই ওকেও থামতে হয়। নইলে সমস্ত সমুদ্রের জল ঢাললেও বুঝি এ জ্বালা কমত না।

॥ ১১ ॥

স্নান শেষ ক'রে বেরিয়ে কোনমতে শাড়িটা বদলে নেয় শুধু —কোন রকম প্রসাধনের চেষ্টা করে না। মাথাটাও আঁচড়ায় না।

কেষ্ট চায়ের কাপ হাতে ক'রে এসে দাঁড়ায়, 'বৌদি, চা।'

'চা আমি এখন খাব না কেষ্ট! তুমি নিয়ে যাও।'

'ওমা, চা খাবে না কী গো, সাত সকালে হুড় হুড ক'রে তো শুচ্ছেব জল ঢেলে এলে মাথায়। তার ওপর চা-ও খাবে না?'

'আমার সকালে স্নান কবাই অভ্যেস। তাছাডা পুজো না ক'রে আমি কিছু খাই না।'

'ও তাই বুঝি?···তা পূজো—দেখি যোগাড় টোগাড় আছে কি না, ওসব তো গিন্নিমাই নিয়ে আসে আসার সময়—'

'তোমাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না ভাই কেষ্ট, তুমি শুধু একটা কাজ করো দিকি, ছুটে নদীর দিকটা একবার দেখে এসো দিকি—সে দাদাবাবুকে খুঁজে পাও কি না? বলো গে যে বৌদি ডাকছে —বিশেষ জরুরী দরকার, বলো গে তার শরীব খুব খারাপ—এখনই ডাকছে।'

কেষ্ট চায়ের কাপটা সেখানেই নামিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নীলিমা বাগানের দিকে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল মাথা হেঁট ক'রে নিখিল দাঁড়িয়ে আছে।

'বৌদি, অপরাধ হয়ে গেছে, আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি। আপনি—আপনি কিছু মুখে দিন। আমি নিজে যাচ্ছি পবুকে খুঁজে আনতে। কিন্তু ততক্ষণ অন্ততঃ একটু চা-টা খান।'

'আপনি তাঁকেই খুঁজে ডেকে আনুন আগে। আমি এখনই বাড়ি চলে যাব।'

'আমি—আমি যাচ্ছি বৌদি—কিন্তু এমন ক'রে একেবারে মুখে কিছু না দিয়ে যদি চলে যান—তাহলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। এমনিই তো লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাচ্ছি। এবারের মতো ক্ষমা ক'রে মানিয়ে নিন, নইলে ঝি-চাকরের কাছে বড় অপ্রস্তুত হবো।...দোহাই আপনার—আমি কথা দিচ্ছি—আর কোন দিন কোন ছুতোয় আপনার সামনে যাব না।'

সে সত্যিই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

নদীর দিকের পথই ধরে সে।

নীলিমাও অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থেকে—সেই প্রায়-জুড়িয়ে-যাওয়া চায়ের কাপটা তুলে নেয়।

লোকটা সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে। তাছাড়া যখন আর কোন দিন এখানে আসছে না, ও মুখও দেখছে না—তখন মিছিমিছি অনর্থক ওকে বিব্রত ক'রেই বা লাভ কি!

স্নান করার ফলেই হোক আর লোকটা অমন ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যেই হোক—নীলিমার জ্বালাটা যেন খানিকটা কমে যায়।

সে চায়ের খালি কাপ নামিয়ে রেখে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখতে থাকে।

কিন্তু প্রথমেই, নিচের তলার মাঝের ঘরটাকে ঢুকে চমকে যায় সে।

ছাদের কড়ি থেকে ঝুলছে বিরাট একটা চার কোণা কাঠের আড়া—তার ওপর থরে থরে সাজানো রয়েছে লেপ তোশক বালিশ—বাড়তি শয্যা। অন্ততঃ আর চার পাঁচটা লোকের শোবার মতো।

অনেকক্ষণ সেই খানে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে সে।

আর একটা কুটিল সংশয় তার মনে দেখা দিয়েছে।

সেটার নিরসন না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না।

ওপরে উঠেই আগে যায় মাঝের ঘরে, অর্থাৎ যে ঘরে নিখিলের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেইখানে।

ঘরে ঢুকে চারিদিক চায় সে।

তাবপর হেঁট হয়ে খাটের তলায় উঁকি মারে।

যা ভেবেছিল তাই ঠিক।

ছুটি গেলাস পাশাপাশি সাজানো রয়েছে—ঐ ওদিকের দেওয়ালের ধারে।

অর্থাৎ কেষ্ট জলের ঘটি রেখে যাবার সময় ছুটো গেলাসও বেখে গিয়েছিল। সেটি কেউ সযত্নে আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে!

নীলিমার মুখের রেখা কঠিনতর হয়ে উঠল এই আবিষ্কারে।

নিরুদ্ধ রোষে তার চোখ মুখ অরুণবর্ণ ধারণ করল।

সে আস্তে আস্তে নিচে নেমে বাগান পেরিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

পবিত্রকে যারা খুঁজতে গিয়েছিল—তাদের মধ্যে আগে ফিরল কেষ্টই।

'না, বৌদি সে-মাথা এ-মাথা সব ঘুরে দেখে এলাম—দাদাবাবু কোথাও নেই।'

'তা হ'লে—তা হ'লে কোথায় গেল? তুমি যে বললে নদীতে মাছ ধরতে গেছে?'

'ওই, নাও! আমাকে যা বললে তাই তো বলব। তা যদি সেই ওদিকে একটা বিল আছে সেখানে গিয়ে থাকে তো আমি জানি না বাপু।'

'সে বিল কত দূর কেষ্ট? একবার খুঁজে দেখলে না কেন?'

'সে কি ক'রে দেখব বৌদি। সে, এখান থেকে অন্ততঃ পাক্কা দুটি কোশ।·· আমার এখানে ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে—সে সব করে কে?'

'আচ্ছা, কেষ্ট কালকের সে গাড়িটা কোথা গেল বলতে পারো? যেটায় আমরা এলুম?'

'সে তো এ গাঁয়ের নয়। গাড়িটা আমাদেরই—মোষ নিয়ে আসে দোস্‌রা লোক। তাকে বলে দেওয়া হয়েছে পরশু ভোরে মোষ নিয়ে আসতে!'

'আচ্ছা, তাকে খবর পাঠানো যায় না?'

'কাকে দিয়ে পাঠাব বলুন।'

বাড়ির মধ্যে যেতে যেতে উত্তর দিল সে।

কেষ্টর এসব বাজে কথা আর প্রশ্ন ভাল লাগছিল না।

তাছাড়া সত্যিই তার বহু কাজ পড়ে আছে। এই তো মানুষটা—ভোর থেকে উঠে এস্তক টিউকল ঠেঙ্গিয়ে অতকষ্টে যা জল তুলেছিল কেষ্ট, সব শেষ করে এল হুড় হুড় ক'রে। আরও তো মনিষ্যি বাড়িতে আছে, তারা ঢালবে কি? আবার এই এত ছিষ্টি কাজের মধ্যে ওকেই তো সে জল তুলে রাখতে হবে।

কিন্তু সে চলে গেলে নীলিমার চলবে না। ঈষৎ আকুল কণ্ঠেই সে আর একটি প্রশ্ন করে, 'এখানে আর কোন গোরুর গাড়ি পাওয়া যায় না ভাই কেষ্ট, আমাকে একটু রানাঘাট পৌঁছে দেবে?'

'বলি সে তো দাদাবাবুরা না এলে নয়—তা তেনারাই তখন বন্দোবস্ত করতে পারবেখুনি।'

ভ্রূ কুঁচকে উত্তর দেয় সে।

'দাদাবাবুরা যদি এখন না আসে—আমি একাই চলে যাব।'

'ওমা—মেয়েছেলে এই বুনোপথে একা যাবে কি। না না, এ বাপু তোমার কথাবাৰ্ত্তারা আমার ভাল বোধ হচ্ছে না! সে আমি পারব না।'

কেষ্ট এবার বেশ একটু বিরক্ত ভাবেই চলে যায়।

তার মুখের দিকে চেয়ে—বিশেষত তার কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল, তারপব আর কোন প্রশ্ন করতে সাহসে কুলোয না নীলিমার।

॥ ১২ ॥

বেলা বাড়তে থাকে ক্রমশঃ, রোদ চড়ে ওঠে। আটটা নটা বেজে যায়—তুই বন্ধুর কেউই ফেরে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়েই নীলিমাকে বাড়ির মধ্যে ফিরতে হয়।

কিন্তু তবু সে একেবারে ভেতরে ঢোকে না, বাগানের দিকের রকে এসে অবসন্ন ভাবে বসে পড়ে।

কেষ্ট আসে একথালা খাবার হাতে ক'রে।

মিষ্টি কালকের আনাই ছিল ঢের, সেই সঙ্গে কেক্, প্যাস্ট্রি, কাজু বাদাম ভাজা। খানকতক লুচি আর আলুও ভেজেছে কেষ্ট।

অপটু হাতে তাই সাজিয়ে নিয়ে এসেছে—উলটো পাল্টা যেটা যেখানে খুশি এই ভাবে।

'বলি তেনারা তো এল না। তা আপনি কিছু মুখে দাও, কত বেলা টাঙিয়ে থাকবে!

'না কেষ্ট, তখন চা খেয়েছি—আর কিছু খাব না।'

'সে আবার কি কথা? ও বুঝেছি, দাদাবাবুর সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বুঝি? তাই চলে-যাব চলে-যাব করতেছ! নাও, ও সব তো হামেশা হয় গো, ও রাগারাগির কি কোন মানে আছে! ওঠো ওঠো, হাতটা ধুয়ে মুখে কিছু দাও।'

এত দুঃখের মধ্যেও তার কথা বলার ভঙ্গীতে নীলিমা হেসে ফেলে।

'না কেষ্ট, সত্যিই বলছি রাগারাগি-টাগি কিছু নয়—কাল যা খেয়েছি ভাল ক'রে হজম হয় নি। আর বাড়ি যেতে চাইচি—এই শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম—মার মানে আমার শাশুড়ীর খুব অসুখ—

মনটা তাই বড় ছটফট করছে। লোকে বলে ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়।'

'তা বলে বটে। তা কৈ, তেমন তো ফলতে দেখি না। সেদিন আমি ভোরে স্বপন দেখলুম বাগানের মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাঁচকুড়ি টাকা পেয়েছি। তা পাঁচকুড়ি তো পাঁচকুড়ি—এককুড়ি পয়সাও পেলুম না। ও সব কথার কথা।'

তবু তার বহু পীড়াপীড়িতেও নীলিমা কিছু খেতে রাজী হয় না। শরীর তার খারাপ, খেলে অসুখ করবে—এই অজুহাতে এড়িয়ে যায়।

'তাই তো। আমাদের দাদাবাবুই বা কোথায় গেল, কী রান্না হবে টবে—কিছুই তো বলে গেল না। দুটিই উধাও। ভালো জ্বালা হয়েছে আমার। যত সব অবতার এক একটি!'

॥ ১৩ ॥

নিখিল ফিরল বেলা এগারোটারও পর।

উস্‌কোখুস্‌কো চুল, শ্রান্ত ঘর্মাক্ত মুখ। ঘোরা-ঘুরির চিহ্ন স্পষ্ট।

সে এসে অপরাধীর মতো মুখ ক'রে বলল, 'কোথায় যে গেল স্টুপিডটা, মাছ ধরবার নাম ক'রে! আমি সেই বিলের ধার পর্যন্ত ঘুরে এলাম—কোথাও নেই।'

নীলিমার উগ্র কঠিন মুখ এবং বাইরে বসে থাকায় সে একটু ভয় পেয়েই গিয়েছিল।

নীলিমা সামনের ম্যাগনোলিয়া গাছটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি এখনই বাড়ি ফিরে যাব, আপনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

'এখনই—কিন্তু গাড়ি তো আমি পরশু ভোরে আনতে বলেছি গাড়োয়ানকে। আজকে এখন তো তাকে খবর দেওয়াও যাবে না।'

'এখানে আরও গাড়ি আছে শুনেছি। যে কোনও গাড়ি পেলেই চলবে।'

একটু ধাপ্পাই দেওয়া হল—কিন্তু নীলিমারও তখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, সে আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। যে কোন উপায়ে এ কারাগার থেকে তার মুক্তি চাই।

'আচ্ছা, দেখছি। কিন্তু আপনি খাওয়া দাওয়া করুন তো। পবুর জন্য বসে থেকে লাভ নেই।'

'আমার খাওয়ার দরকার নেই। আপনি দয়া ক'রে গাড়ি একটা ঠিক ক'রে দিন—'

'কিন্তু অকারণ এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বৌদি, সে না এলে তো

আপনি যেতে পারছেন না। সে ফিরুক স্নানাহার করুক—তার পর তো!

'সে যে আজ ফিরবে না—তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। আমি একাই যাব। আর এখনই।'

'তার মানে?'

'তার মানে আপনি ভেবে দেখুন। বিছানার রাশ দেখে এসেছি ঐ ঘরে, জলের গেলাস দুটোও খাটের নিচে থেকে সরাতে ভুলে গিয়েছিলেন—তাও চোখে পড়েছে। আপনাতে আর সেই পশুটাতে মিলে পরামর্শ ক'রে করেছেন সব। সে আজ আসবে না আমি জানি—যদি এখনই গাড়ি ডেকে না দেন তো আমি হেঁটেই বেরিয়ে যাব।'

নিখিল মাথা হেঁট ক'রে কি ভাবে খানিকটা। তার পর বলে 'বেশ, আপনি খাওয়া দাওয়া সারুন। আমিও স্নানাহার সেরে নিই। ইতিমধ্যে গাড়িরও ব্যবস্থা একটা ক'রে রাখছি। আমিই বিকেলে আপনাকে রানাঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'দেখুন. বারবার কেন খাওয়া-দাওয়ার কথা বলছেন। আমি চা এক কাপ খেয়েছি সকালে—আপনাদের বাড়ির অলক্ষণ হ'তে দিই নি। কিন্তু আর আমি জলস্পর্শ কবব না এ বাড়িতে। আর আপনাকেও পৌঁছতে যেতে হবে না।'

হঠাৎ যেন নিখিলের চোখ জ্বলে ওঠে।

সেও বেশ দৃঢ়স্বরে বলে, 'এ আমার দেশ, আমাদের জমিদারী। আমার বিনা হুকুমে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না। যে ইজ্জতের ভয় করছেন অন্ততঃ সে ইজ্জৎ নিয়ে যেতে পারবেন না। ...আমারও একটা দায়িত্ব আছে, একা আপনাকে এই বনের পথে ছাড়তে পারব না। গেলে আমার সময়-মতো আমার সঙ্গে যেতে হবে! এক পবিত্র এসে নিয়ে যেত সে আলাদা কথা!'

একটা সীমাহীন বল্‌গাহীন ক্রোধেই নীলিমার কান মাথা আগুন হয়ে ওঠে—কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। সে যে কত অসহায়, কী সাংঘাতিক ফাঁদে পড়েছে সেই ভেবেই নিজেকে সামলে নেয়।

অনেক চেষ্টার পর সেই দুঃসহ ক্রোধ দমন ক'রে আস্তে আস্তে বলে, 'বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তিনটের মধ্যে যদি যাওয়ার ব্যবস্থা না হয় তাহলে ইজ্জৎ নিয়ে বেরোবার অন্য ব্যবস্থাই করব।'

বাড়ির দিকে যায় সে বলতে বলতেই।

'অত কিছু করবার দরকার হবে না।' বাঁকা সুরে জবাব দেয় নিখিল।

নীলিমা খেল না প্রায় কিছুই—একটু কিছু মুখে তুলল শুধু। নিখিল ওর সামনে আর আসে নি—সম্ভবত অন্য কোথাও বসে খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু তার জন্যে মাথা-ব্যথা নেই নীলিমার। সে কোন মতে মুখটা ধুয়েই বাগানে এসে একটা গাছ তলায় বসল।

একটু পরে কেষ্টই এসে খবর দিলে, 'আপনার গাড়ির ব্যবস্থা ক'রে এলুম বৌদি।'

'কৈ, এসেছে গাড়ি?'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় নীলিমা।

'রোস। এখনই কি তারা আসে? একজনের চাকা খোলা, একজনের গোরুর পায়ে নাল নেই। যে আসতে রাজী হ'ল তার বৌকে কুটুম বাড়ী পৌঁছে না দিয়ে আসতে পারবে নি। সে সেই যার নাম চারটে।

'চারটে! তবে পৌঁছব কখন?'

'ও সে ঢের পৌঁছতে পারবে। এখান থেকে সাড়ে চারটেতে বেরোলেও ঝিকিমিকি বেলা থাকতে থাকতে সদরে পৌঁছে যাবে। কত আর পথ—দু ঘণ্টার বৈ তো নয়।'

'আর একটা গাড়িও পেলে না—হ্যাঁ কেষ্ট? ছাখ না ভাই, তোমাকে আমি দশটাকা বকশিশ করব।'

'না বৌদি, পেলে আর আনতুম না? কেউ নেই যে এখানে—গাঁয়ে আর কটা লোক থাকে।'

গাঁ যে কতটুকু আর কোথায়—তা এখান থেকে তো বোঝাই যায় না—সুতরাং কেষ্টর কথাটা অবিশ্বাস করবারও কোন কারণ নেই। নিতান্তই সামান্য জায়গা।

হতাশ হয়ে বসে পড়ে নীলিমা, 'দেখো কিন্তু ঠিক যেন চারটেয় আসে। আর যেন দেরি না হয়।'

'না না। আপনি নিশ্চিন্তি থাকো।'

গাড়ি এল সাড়ে চারটেরও পর।

একবার বসে একবার ছুটে বাইরে বেরিয়ে যখন নীলিমা প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে, তখন দূরে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্যাঁচকোঁচ শব্দটি শোনা গেল।

নীলিমা অনেক আগেই তার স্যুটকেশটা বাইরে এনে বসে আছে।

গাড়ি এসে থামবামাত্রই সে এসে উঠে বসল—মোষ সরিয়ে, কোনমতে গাড়ি জোতা অবস্থাতেই উঠে পড়ল সে।

তার আর এক মুহূর্তও তর সইছে না।

'চল চল গাড়োয়ান—শিগ্‌গির গাড়ি ছাড়—আর দেরি করলে পৌঁছতে পারব না।'

গাড়োয়ান তার রকম-সকম দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।

তার এই অশোভন ব্যগ্রতাই যথেষ্ট সন্দেহজনক, তার ওপর তার বেশভূষা দেখে পাগল বলেই ঠাহর করল সে।

শহরের মেয়ে, বাবু-ভাইদের মেয়ে মানেই প্রসাধন আর সজ্জা।

নীলিমার সঙ্গেও আছে সব কিন্তু সকাল থেকে সে সব ব্যবহার করার মতো মনের অবস্থা একবারও ফিরে পায় নি।

স্নান করার পর মাথাটাও বাঁধে নি সে।

ফলে পাগলের মতোই দেখাচ্ছে তাকে।

গাড়োয়ান বলল, 'দাঁড়াও বাপু। বাবু আসুক হুকুম দিক তবে তো গাড়ি ছাড়ব। তোমার মুখের কথায় তো ছাড়ব না।'

'বাবু কি হুকুম দেবে—টাকা তো? টাকা আমি দেব। পাঁচ দশ—যা চাও।'

'টাকার কথা হচ্ছে না। হুকুমটাই বড়! হ্যাঙ্গামকে বড় ভয় আমার!'

তার কণ্ঠস্বর দ্বিধাশূণ্য, বক্তব্য স্পষ্ট।

নীলিমা বোধকরি ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলত এর পর—কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না।

বাইরের দিক থেকে নিখিল এক রকম পবিত্রকে টানতে টানতেই নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

বাইরের দিক অর্থাৎ নদীর দিক।

পবিত্রর হাতে তখনও খানিকটা মুগা সুতো আর বঁড়শি।

একটা থলিতে সম্ভবত মাছ কতকগুলো।

পায়ে কাদা, মুখচোখ রৌদ্রে বসে গিয়েছে। স্নানাহার কিছুই হয় নি।

নিখিলের ও ছুটো পর্ব সারা হ'লেও সেও যে বহুক্ষণ রোদে ঘুরেছে, সে-ছাপ তার সর্বাঙ্গেই।

তারও পাযে কাদা, জামা ঘামে ভিজে উঠেছে, মুখ যেন রোদে পুড়ে উঠছে ইতিমধ্যেই।

'ওকেই ধরে এনেছি বৌদি, ও-ই আপনার সঙ্গে যাবে। ভয় নেই। শুধু একটু চা খাইয়ে দিই বেচারাকে, সকাল থেকে একটু জলও খায় নি বোধ হয়।···পাগল, একদম পাগল তুই, বুঝলি! চ চ।···হানিফ, তুমি আর মোষ খুলো না—বাবু এখনই আসছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তুমি তাড়াতাড়ি একটু হেঁকে যেয়ো, যাতে সাতটার গাড়িটা অন্ততঃ ধরতে পারেন এঁরা।'

'যে আজ্ঞে, আমি হেঁকেই যাব।'

নীলিমা এসব একটা কথারও জবাব দেয় না।

পবিত্র একটু বিপন্ন মুখেই এসে দাঁড়িয়েছিল, সম্ভবত প্রবল ঝড়ের আশঙ্কা করছিল নীলিমার তরফ থেকে।

কিন্তু নীলিমা একটাও কথা না বলাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ভেতরে চলে গেল।

নিখিল যতই বলুক পাঁচ মিনিট—একটু স্নান সেরে, চা আর জলখাবার খেয়ে পবিত্রর বেরোতে পাকা আধ ঘণ্টাই হয়ে গেল।

নীলিমা বার বার হাতঘড়ি দেখছিল আর রাগে ক্ষোভে ঠোঁট কামড়ে প্রায় রক্তাক্ত ক'রে তুলছিল।

পবিত্র এসে বসার পর গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে প্রায় সাড়ে-পাঁচটা বেজে গেল।

ওদের যাত্রার সময় কিন্তু নিখিল আর এল না।

দীর্ঘ পথ। স্বামী স্ত্রী পাশাপাশিই বসে এক রকম—কিন্তু একটিও কথা নেই দুজনে।

নীলিমা ঠিক গাড়োয়ানের পেছনে বসে প্রাণপণে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

স্বামীর দিকে একেবারে পিছন ফিরেই বসেছে সে।

পবিত্র পিছনে বসে নিঃশব্দে সিগারেট টানছে।

এটা ওর এত দিন ছিল না, এই নেশাটা। ব্যবসা ধরে—অতিরিক্ত খাটা-খাটুনির ফলেই নাকি ধরতে হয়েছে।

পবিত্রও কথা কইবার কোন চেষ্টা করে নি।

সম্ভবত নিজের অপরাধের গুরুত্বটা ভেবেই চুপ ক'রে আছে সে—অপরাধীর মতো।···

বার বার ঘড়ি দেখছে নীলিমা।

হেঁকে যাবার প্রতিশ্রুতি যতই দিক হানিফ, তার মোষ জোড়া আদৌ চলছে না যেন।

হানিফের অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি নেই।

'হেট হেট—আ মলো যা। আর তোর মোষের পোর নিকুচি করেছে রে।' ইত্যাদি সব রকম সম্ভাষণই সে ক'রে যাচ্ছিল,

ল্যাজও নলছিল মধ্যে মধ্যে—কিন্তু মহিষ-যুগল নির্বিকার। মনে হচ্ছে তারা সমস্ত মাটিটুকু পা দিয়ে মেপে মেপে চলতে চায়।

ছদিকে বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে সরু মেটে পথ।

দেখতে দেখতে সেই সব গাছের ছায়ায় সন্ধ্যার আব্ছায়া নেমে আসে।

সাড়ে ছটার পর আর অনেক চেষ্টা ক'রেও হাত-ঘড়ির ঘণ্টা-মিনিটেব কাঁটা দেখতে পায় না নীলিমা।

গাঢ় নিঃসীম অন্ধকার।

গাছের আড়াল ভেদ করে আকাশেব তারাও দেখা যায় না।

শুধু কতকগুলো জোনাকি জ্বলছে চারিদিকে দপ-দপ ক'রে—অন্ধকাবে সেই অসংখ্য ঘূর্ণায়মান আলোক-মালার দিকে চাইলে কেমন যেন ভয় ভয়ই করে।

আবও খানিকটা এই অন্ধকারেব মধ্য দিয়ে যাবাব পর মোষ ছুটো একেবারেই দাঁড়িয়ে গেল।

'আবে হেই—কী হ'ল বে তোদেব! চা চা—আ মোলো রে! বেটা মোষেব পোদেব বজ্জাতিটা ছাখো দিকি একবার!'

ইত্যাদি যথাবীতি ভর্ৎসনাদি করবার পর হানিফ নেমেও একটু কি চেষ্টা-চরিত্র করল। তারপর কেমন যেন একটু ভয় ভয় গলায় ডাকল, 'বাবু!'

'কী রে!' যেন তন্দ্রা ভেঙ্গে তড়াক ক'রে লাফিয়ে পড়ল পবিত্র।

'কী হয়েছে?'

'বাবু, আমার কেমন সন্দ হচ্ছে!'

'কী সন্দ হচ্ছে?'

'মোষ কিছু গন্ধ-টন্ধ পেয়েছে।'

'গন্ধ? কিসের গন্ধ?'

'মানে তানারা কেউ বেরিয়েছেন। তাই ওরা আর একদম নড়তে চাইছে না।'

'তানারা মানে—ভূত ? এই মরেছে! বেটার মাথা বুঝি একেবারেই খারাপ হ'ল এবার!'

'না বাবু, তেনারা মানে অন্যি-দেবতারা লয়। এ যেন চারপেয়ে দেবতা বলে মনে হচ্ছেন!'

'সে কি রে!'

'হ্যাঁ বাবু। শুনছিলাম বটে কদিনই যে একটা বাঘ দেখা দিয়েছেন এদিকে, তা মানুষ-জন খায় নি—গোরু খায়।...তা টরচের আলো আছে সঙ্গে ?'

'আছে।' বলে পবিত্র আন্দাজে নীলিমার কোলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর স্যুটকেসটা খুলে টর্চটা বার ক'রে নিল।

'চ দিকি কোথায় তোর বাঘ, দেখে আসি একটু ঘুরে!'

দেখতে দেখতে, নীলিমা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে কিছু বলবার কিম্বা বাধা দেবার আগেই, দুজনে সেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর, ওদের চেহারাটা সেই মসীময় অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই, নিজের অবস্থাটা আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারল নীলিমা।

নির্জন বনের মধ্যে একা মেয়েছেলে পড়ে রইল সে।

একটা টর্চ ছিল—তাও চলে গেল।

মনে পড়ল—একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই কাছে!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রবল সন্দেহ মাথা তুলতে চাইল মনে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাটা দমন করল সে।

তাই কখনও হয়? মানুষ এত অমানুষিক রকমের পিশাচ হ'তে পারে ?

না, না। তা সম্ভব নয়।

বলে, তবু যেন ভরসাও পায় না ঠিক।

কোথায় যেন একটা আতঙ্ক আর হিম হতাশা অনুভব করে মনের মধ্যে।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, হয়ত বা আধ ঘণ্টাই কেটে গেল।

কে জানে, সময়ের হিসেবও আর নেই।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। সব বুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে তার।

কিছু ভাবতেও পারছে না। কিছু বুঝতেও পারছে না যেন।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। আরও কিছুক্ষণ।

হয়ত বা বহুক্ষণই। হয়ত বা এক যুগই। কে জানে!

হঠাৎ কী একটা খস খস আওয়াজ উঠল ঠিক গাড়ির পাশে।

চাপা আওয়াজ। তবু স্পষ্ট।

'কে?' বলে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সে—কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না।

আবারও সেই শব্দ। আর একটু স্পষ্ট এবার।

কে একজন কিম্বা কী একটা গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়াল।

জোনাকির আলোতে বাইরের দিকটা আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল—তাইতেই ছায়া পড়েছে।

সে আলোটুকুও আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছে কে।

যে দাঁড়িয়েছিল সে এবার গাড়িতে উঠে পড়ল নিঃশব্দেই।

এবার প্রাণপণ চেষ্টায় চেঁচিয়ে উঠল সে খানিকটা।

'চুপ!' বলে সে ওর মুখটা চেপে ধরল একটা হাত দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বজ্র-কঠিন বাহুবন্ধনে আকর্ষণ করল নিজের দিকে।

সে বন্ধন ছাড়াতে পারল না নীলিমা। মুখ থেকেও পারল না হাতখানা সরাতে।

ভয়ে কেমন বিহ্বল আর অবশই হয়ে পড়েছিল সে।

সকাল থেকে এত রকম আবেগের সঙ্গে লড়াই ক'রে আর তার লড়বার শক্তিও ছিল না বোধ হয়।

আর কিছু জানে না নীলিমা।

কখন ও শহরে এসেছে, কখন ঐ নিখিলেরই আদেশে নেমে এসেছে গাড়ি থেকে, চেপেছে সাইকেল রিক্সায়—কিছুই ভাল ক'রে জানে না সে।

সাইকেল রিক্সা থেকে নেমে যন্ত্রচালিতের মতোই স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রেণ এলে একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরার দোর খুলে ওকে যখন উঠতে বলছে নিখিল তখনও বিনা বাক্যব্যয়ে উঠেছে, হাতের মধ্যে টিকিটটা গুঁজে দিয়েছে সে—সেটা বেশ মুঠো ক'রেই ধরেছে—কোনও রকম অস্বাভাবিক আচরণ করে নি।

কিছু বলেও নি নিখিলকে।

বলার তার কিছু নেইও।

শেষ মুহূর্তে তাকে অব্যাহতিই দিয়েছিল নিখিল। হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল—এটা তার মহত্ত্বই বলতে হবে।

তবু যে ওর এই অবশ আচ্ছন্ন অবস্থা—তার কারণ ওর সমস্ত চৈতন্য আবরিত আচ্ছন্ন ক'রে শুধু কানে ও মনে বাজছিল নিখিলের সেই ভয়ঙ্কর কথাগুলো, ওকে উঠতে বলে নিজেই গোরুর গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে যা বলেছিল, 'মনে ক'রো না যে এটা দান কি ভিক্ষা, কি আমি জবরদস্তীতে কিছু নিতুম। দস্তুরমতো টাকা দিয়ে কিনেছি। ...হ্যাঁ—তোমার স্বামীকে দু'শো পাঁচশো ক'রে বহু টাকা গুণে দিয়েছি—শোধ দিতে না পেরে তোমাকে এনে তুলে দিয়েছে—for value received in cash! ...স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনানুরোধে। যদি দেখা হয় তো খুঁজে দেখতে পারো—তার পকেটে সে হ্যাণ্ড-নোটগুলো বোধ হয় এখনও আছে। আমি যে বরং ছেড়ে দিলুম—এইটেই আমার দান। অনুগ্রহ।'

সেই কথাগুলোর বজ্র-গর্জনই তার সমস্ত দুঃখ সমস্ত লজ্জা অপমান—অসহায় ক্রোধ ও ক্ষোভ ছাপিয়ে সমস্ত চৈতন্যকে জড় অভিভূত ক'রে রেখেছে।

তাই আর কিছুই মনে নেই তার। আর কোন বোধ নেই।

*   *   *

বাড়িতে ফিবতে শাশুড়ি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠেছিলেন।

কী যেন প্রশ্নও করেছিলেন।

বোধ হয়, বোধ হয়—হ্যাঁ, যেন বলেছিলেন, 'এ কী কাণ্ড বৌমা। এ কী তোমার চেহাবা?...পবু, আমার খোকা কোথায়? তুমি একা ফিরলে যে? আজই বা ফিরলে কেন? তোমাদের তো কাল আসবার কথা!'

কিন্তু সে কথা কানে যায় নি নীলিমার। জবাবও দেয় নি তাই।

সোজা এসে শ্বশুরের পায়ের কাছে বসেছিল।

না, কাঁদে নি! কপাল চাপ্ড়ায় নি।

গলাও কাঁপে নি তাব।

চোখ শুকিয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে চোখেব জলও।

একদিনে সব কোমলতা সব সরলতা—এমন কি সব সজীবতাও বোধ হয় চলে গিয়েছিল তার মধ্য থেকে।

সব কথা একটি একটি ক'রে খুলে বলেছিল শ্বশুরকে। সহজ শুষ্ক নিরাসক্ত কণ্ঠে। পেছনে শাশুড়ী এসে দাঁড়িয়েছেন কি না তা সে দেখে নি।

বলা শেষ হ'তে একটু হেসেছিল সে।

কঠিন সে হাসি।

কিন্তু জয়দেব সপ্ততীর্থ তা দেখতে পান নি।

বধূর চোখে চোখ পড়ায় লজ্জা ঢাকতে চোখ বুজেই বসেছিলেন—বহুক্ষণ ধরে।

আবারও হেসেছিল নীলিমা।

পাগলের মতো অর্থহীন হাসি।

প্রকাশ পেত তার আচরণে। কাজকর্মের চেষ্টা যে করছে সে খবরও পাচ্ছিল নীলিমা। শেষে যখন শুনল যে এবার তার শ্বশুরমশাই নিজেই—পবিত্রর কাগজপত্র দেখে দশ হাজার টাকা বার ক'রে দিয়েছেন—মূলধন হিসেবে, তখন আরও একটু বোধহয় আশান্বিত হয়েছিল। সত্যি-সত্যই নাকি সরকারী ঠিকে পেয়েছে সে—কোথায় কোয়ার্টার তৈরী করার, খানিকটা কাজ আরম্ভ করলে সরকার ক্ষেপে ক্ষেপে টাকা দেবেন—এ প্রতিশ্রুতি নাকি জয়দেব নিজে চোখে দেখেছেন।

যে বিশ্বাস করতেই চায়—সে এবার একটু একটু বিশ্বাস করতে শুরু করবে—এতে আর আশ্চর্য কি!

এর পর বেশ কয়েকদিন ক'রে অনুপস্থিত থাকতে লাগল পবিত্র। আট দশ দিন বাদ বাদ আসত, একবেলা কি একদিন থেকে চলে যেত আবার। নীলিমা শুনত, গিরিজায়ার কাছে বসে যখন গল্প করত পবিত্র—তখন সকলের শ্রুতিগম্য ক'রেই বলত, বাড়ি তৈরীর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইটখোলার ইজারা নিয়েছে ...ন, লোক রেখে ইট তৈরী করাচ্ছে; কয়েক লাখ কাঁচা ইট তৈরী হয়ে গেলেই পাঁজা পোড়াতে শুরু করবে।

'তা তুই আবার অত ছিষ্টি করতে যাচ্ছিস কেন, এই তো এখানে দেদার বাড়ি হচ্ছে সব, ইট কিনেই তো করে দেখি। ইটখোলায় ইট পুড়িয়ে কে কত ইমারৎ করছে!' গিরিজায়া প্রথম দিন প্রশ্ন করেছিলেন।

তার উত্তরে পবিত্র বলেছিল, 'এ তো আর আমি সোজাসুজি ডিরেক্ট্ কনট্রাক্ট্ পাই নি—সাব কনট্রাক্ট এটা, তাতে ইট কিনে কাজ করতে গেলে কিছুই থাকবে না। আমার নিজের তৈরী ইটে যদি খরচা পড়ে চব্বিশ টাকা হাজার—বাজারে কিনলে সেটা দাঁড়াবে ষাট টাকা। অনেক তফাৎ!'...

ছেলের ব্যবসা-বুদ্ধির এই প্রকৃষ্ট উদাহরণে মার গর্বের শেষ থাকত না। আর নীলিমার মনেও—গর্ব না হোক—কিছুটা আশ্বাস জাগত। হযত এখনও সময আছে, আবাবও হযত ফিবতে পাবে লোকটা, মানুষের মধ্যে মানুষ হযে মাথা তুলে দাঁডাতে পারে।··

এর মধ্যে একদিন অসময়ে খুব খানিকটা ঝড-জল হযে গেল।

ঝড জলেব সঙ্গে পবিত্রর ব্যবসাব কোন সম্পর্ক থাকতে পাবে এরা তা জানত না। কিন্তু তিন চার দিন পবে পবিত্র যেদিন বাডি এল ওব মুখের দিকে চেযে শিউবে উঠল সকলে। মুখে কে যেন কালি মেডে দিয়েছে, একহারা চেহারা আবও শীর্ণ দেখাচ্ছে—তিন দিনে যেন বুডো হযে গেছে লোকটা।

গিরিজাযা তো চিৎকার ক'রে কেঁদেই উঠলেন ছেলের দিকে চেযে। এমন কি চিরপ্রশান্ত জযদেব সপ্ততীর্থও কিছুটা বিচলিত না হযে পাবলেন না।

'ব্যাপার কি বাপু? তোমার এমন চেহাবা কেন, কোন অসুখ-বিসুখ কবে নি তো? নাকি কোন বিপদ-আপদ—? মোটারকমের টাকাকডি কিছু খোয়া যায নি তো?'

'না বাবা, খোযা যায নি, ধুযে বেরিযে গেছে।'

'তার মানে?'

সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

মানেটা বুঝিয়ে দেয পবিত্র। তখন অবশ্য কারুবই বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই ঝডজল—অকালেব কালবৈশাখী—ওখানেও হযেছে, ওর ইটখোলায়। তার ফলে প্রায় আশি লক্ষ কাঁচা ইট ধুয়ে গলে নষ্ট হয়ে গেছে। যা-ও সামান্য আছে, তা জলদাগী হয়ে গিয়েছে। সে ইট দিয়ে গাঁথুনীর কাজ চলবে না।

'এখন উপায়?' উদ্বিগ্ন গিরিজায়া প্রশ্ন করেন। স্বামীর মুখের দিকেও চান একবার।

অর্থাৎ আর কিছু টাকা তিনি দিতে পারবেন কিনা।

কিন্তু পবিত্র ঘাড় নাড়ে। বলে, 'না, বাড়ির টাকা নিয়ে আর জলে ফেলতে চাই না। অন্য সব কনট্রাক্টরদেরও তো ওই অবস্থা হয়েছে, তারা চেষ্টা করছে সরকারী দপ্তর থেকেই কিছু য়্যাডভান্স নিতে। এই ডিসাষ্টারের কথা শুনলে হয়ত দিতেও পারে। সবাই মিলে য়্যাপ্রোচ করা দরকার বলেই আমি এসেছি, তাতে কিছুটা জোর বাড়ে। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরেই রাইটার্স বিল্ডিং বেরিয়ে যাবো—'

'সে কি, একটু বিশ্রাম নিবি না?'

'বিশ্রামের কি সময় আছে মা, ভগবানের একবার হাত ঝাঁকানি জলেই লাখ লাখ টাকা গলে ধুয়ে বেরিয়ে গেল—এখন মর্ তোরা ছুটোছুটি ক'রে। নিশ্চিন্তি হয়ে ঘরের ভাত খেয়ে আরাম করার ভাগ্য নিয়ে আসি নি মা আমরা।'

জয়দেব তবু একবার প্রশ্ন করলেন, 'যদি গবর্ণমেণ্ট টাকা না দেন--?'

'না দেন --সকলের যা গতি হবে আমারও তাই। সকলে মিলে কোথাও থেকে ধার-দেনা করতে হবে।...দেখা যাক্।'

তিন-চারদিন ধরে খুব খানিকটা ছুটোছুটি করল সে। তার পর যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই কর্মস্থানে ফিরে গেল আবার। ঠিক কী ব্যবস্থা হ'ল তা কাউকে বলল না, গিরিজায়ার প্রশ্নটা একটা অস্পষ্ট জবাবে এড়িয়ে গেল।

এর পর আবারও যেদিন বাড়ি এল—তেমনি ঝড়ো কাকের মতো চেহারা। চুলগুলো রুক্ষ, চোখের কোলে কালি, মুখ শুকনো। মার উদ্বেগের জবাবে বলল, 'কৈ না, তেমন কিছু নয় তো।... এমনিই—নিজে হাত পুড়িয়ে খাওয়া তো। অর্ধেক দিন খাওয়াই হয়ে ওঠে না, তাই হয়ত—। আর যা জায়গা, পয়সা দিয়ে কিছু

কিনে খাব, সে উপায় তো নেই। ধারে কাছে এমন একটা দোকান নেই যে একখানা বিস্কুট কিনে খাব।'

'সে কি রে! এমন হ'লে বাঁচবি কি ক'রে?···তা রান্নার জন্যে লোকজন পাওয়া যায় না?'

'হ্যাঁ! তুমিও যেমন! সে সব যা লোক তাদের হাতে জলই খেতে ইচ্ছে করে না--তার ভাত! আর তাই বা এত লোক কোথায় পাব? সার সার ইটখোলা বসে গেছে, তারই মজুর পাওয়া দায় হয়ে উঠেছে, ভাত রেঁধে দেবার লোক কোথা থেকে আসবে?'

'তাহ'লে বাবা, তুই ও কাজ ছেড়ে দে। এখানে একটা কিছু চাকরি-বাকরি দ্যাখ!'

'হ্যাঁ, তা আর নয়! এতগুলো টাকা ফেলেছি— বাড়ির টাকা, পরের টাকা— সব ডুবিয়ে বাড়ি এসে বসব, লোকে গায়ে থুথু দেবে যে!···না না, ও কিছু নয়, কাজটা হয়ে যাক—বাড়িতে এসে এক মাস চেপে বসে তোমার হাতের রান্না খেলেই শরীর আবার ঠিক হয়ে যাবে। ··আর খাই না যে একেবারে, তাও তো নয়। খেতেই তো হবে, নইলে খাটব কি ক'রে! তবে সব দিন ঠিক নিয়মিতভাবে হয়ত হয়ে ওঠে না। কিন্তু তাতে তো চলেও যাচ্ছে, কৈ শুয়েও তো পড়ি নি!'

পবিত্র দার্শনিকের মতো হাসল একটু।

তবু গিরিজায়া সঙ্গে একজন চাকরকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কিছুতেই নিয়ে যেতে রাজী হ'ল না সে। বলল, 'তুমি তো জান মা, যার-তার হাতে খেতে পারি না আমি। তাছাড়া আমার আসা-যাওয়া নাওয়া খাওয়ার কোন সময়ই যে ঠিক নেই। লোক গিয়েই বা কি করবে, পড়ে পড়ে ঘুমোবে বই তো নয়। না না, ওসব ঝামেলায় দরকার নেই।'

কিন্তু তার পরের বার, অর্থাৎ আরও হপ্তা তিনেক পরে যখন

বাড়ি এল পবিত্র তখন আর গিরিজায়ার অশ্রু কোন বাধা মানল না।

'এ কী চেহারা হয়েছে রে তোর? এ যে চেনা যায় না। আমার কাছে লুকোস নি খোকা, মাথা খাস—ঠিক ক'রে বল—কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?'

যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন তিনি।

পবিত্র তার ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে একটু ম্লান হেসে বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়। তোমার আবার বড্ড বাড়াবাড়ি সব তাতেই।'

'তবে এমন হাল কেন তাই বল! জবাব দে। মুখখানা অয়নায় দেখেছিস একবার?'

'তা বাপু সত্যি কথাই বলছি, দেখি নি। যেখানে থাকি আর যে কাজে থাকি, তাতে আয়নায় মুখ দেখার সময়ও থাকে না, দরকারও হয় না···ওসব কিছু না, আসলে এই খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম থেকেই—। মধ্যে কদিন রক্ত আমাশার মতো হয়েছিল, এখন অবশ্য সে সব নেই—। তবে কদিন আবার একটু অর্শর মতোও দেখা দিয়েছে, তাতেই--'

তাতেই যে কি তা আর বলে না। অর্ধসমাপ্ত রাখে কথাটা। কিন্তু এইতেই কাজ হয়। গিরিজায়া বলেন, 'তা হ'লে তুই এবার বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যা। তোর যা দেখছি সেখানে একটা গার্জেন দরকার। ঝি-চাকরে পারবে না তোকে সামলাতে।'

চকিতে অপাঙ্গে একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে পবিত্র বলে ওঠে, 'না না, সেখানে ও কোথায় যাবে! জঙ্গলের মধ্যে থাকি, না কোন ভদ্রবসতি, না কোন ডাক্তার-বদ্যি—তাছাড়া আমি এখান সেখান ঘুরে বেড়াব, যাওয়ার একটা ঠিক আছে, ভোরবেলাই বেরোই—কিন্তু আসার কোন ঠিকই নেই, কোনদিন রাত বারো-টাতেও ফিরি, কোনদিন ফিরিও না হয়ত!'

'তোর যা কাজ' গিরিজায়া বলেন, 'হয় ইট গড়া নয় তো ইমারৎ গড়া, তা সে সব তো মিস্ত্রী মজুর নিয়ে কাজ। কে তোর জন্যে অত রাত অবধি জেগে বসে থাকে তাই শুনি।...অত রাত পর্যন্ত কোথায় ঘুরে বেড়াস?'

'আহা, কাজ বুঝি শুধু ঐটুকু! অন্য যারা ফেলো কনট্রাক্টর তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়, পরের দিনের কাজের যোগাড় সেরে রাখা আছে—লোকজন ঠিক করা—ঝঞ্ঝাট কি একটা মা?'

বেশ মুরুব্বিয়ানা-চালে উত্তর দেয় পবিত্র।

গিরিজায়া সে মুরুব্বিয়ানায় ভোলেন না। প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলেন, 'না না, ওসব কোন কাজের কথাই নয়। আসলে ঘরে টান নেই দায়িত্ব নেই বলেই অমন হল্ল হল্ল ক'রে ঘুরে বেড়াস। তোর কাছ থেকে বুদ্ধি নেবার জন্যে কেউ সেখানে রাত বারোটা অবধি জেগে বসে থাকে না—এ আমি খুব জানি। বৌমা গেলেই টিট্ হবি ঠিক, অন্তত তাকে পাহারা দেবার জন্যেও তোকে সকাল ক'রে ফিরতে হবে।'

পবিত্র এর উত্তরে আরও কিছু ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে—এ প্রস্তাবে তার সত্যিকারের কোন আপত্তি নেই বুঝিয়ে দিয়ে—চুপ ক'রে যায়।

অতঃপর গিরিজায়া পুত্রবধূর কাছে গিয়ে পড়েন, 'লক্ষ্মী মা আমার, তুই অমত করিস নি, ঐ আমার একটা ছেলে। তুই না গেলে কেউ ওকে আর বাঁচাতে পারবে না।'

তবু প্রথমটা রাজী হয় নি নীলিমা, প্রবল আপত্তি তুলেছিল, 'আপনি ওঁকে চেনেন না মা,—এই ওঁর স্বভাব। আমি গিয়ে ওঁর স্বভাব পাল্টাতে পারব না—মাঝখান থেকে নিজে বিপদে পড়ব। ঐ তো শুনছেন মাঠের মধ্যে একখানা ঘরে থাকেন—আশেপাশে কোন ভদ্রবসতি কি লোকালয় নেই, সেখানে গিয়ে আমি থাকব কি

ক'রে ? যেতে হয় আপনিও চলুন, আপনার সঙ্গে আমি যেতে রাজী আছি।'

'সে কি ক'রে হয় বল, ঠাকুর আছেন, তোদের গুষ্টি আছেন—উনি তো ছেলেমানুষের বাড়া, ওঁকে কার কাছে ফেলে যাবো! নইলে আমার কি আর ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে অসাধ ?'

'তাহ'লে আমিও যাবো না।' বেশ দৃঢ়স্বরে জবাব দিয়েছিল নীলিমা।

'ওরে, ও শুধু আমার ছেলে নয়—তোরও স্বামী। আর একটু বয়স হ'লে বুঝবি, মেয়ে জন্মে তার চেয়ে বড় কেউ নেই!'

তাতেও রাজী করাতে না পেরে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠেছিলেন গিরিজায়া। তখন আর নীলিমা 'না' বলতে পারে নি। তাছাড়াও, কে জানে কেন—এতখানি ঘৃণা মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকা সত্ত্বেও—এবার পবিত্রর অপরিসীম শুষ্ক ও শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সেও যেন বিচলিত হয়ে উঠেছিল একটু।

এ মনোভাবের কোন কারণ খুঁজে পায় নি সে। নিজের মনের এই চেহারাটা দেখে সে নিজেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

পবিত্র অবশ্য সবই বলেছিল। মাঠের মধ্যে একখানা ঘর, নির্জন নির্বান্ধব বাসের ব্যবস্থা ; আশপাশে কোন লোকালয় নেই ; একটা ঠিকে ঝি আছে ছ'বেলা কাজ ক'রে দিয়ে বাড়ি চলে যায়, বললে সে হয়ত দিনের বেলাটা থাকতে পারে, তবে তাব কোন নিশ্চয়তা নেই ; তেমন কোন 'কথা' দিতে পারবে না সে। না, গোপন সে কিছুই করে নি, তা নীলিমাও মানতে বাধ্য। তবু সে নির্জন নির্বান্ধব অবস্থাটা যে এই—তা সুদূর কল্পনাতেও ভাবতে পারে নি ও।

পবিত্রর সঙ্গে সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় যখন গো-গাড়ি থেকে নামল ওদের 'বাসা'র সামনে—তখনও দিনের আলো যথেষ্ট, তবু চারিদিকে চেয়ে যেন বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ওর। নিজেকে নির্বোধ বলে, বেকুব বলে, অপরিণামদর্শী বলে গালাগাল দিতে লাগল বারবার। ইচ্ছে হ'ল ডাক ছেড়ে কাঁদতে—এই গোরুর গাড়িতেই ফিরে যেতে এখনই। কারণ আর যাই হোক, এ দৃশ্যর জন্যে ও ঠিক প্রস্তুত ছিল না।

যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—ধূ-ধূ করছে মাঠ, অন্তহীন সীমাহীন। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বহু বর্ণনা সে কাব্যে উপন্যাসে পড়েছে, বোলপুর থাকতেও কিছু কিছু মাঠ দেখেছে—যদিও রবীন্দ্রনাথের আমলে যে এবং যত মাঠ ছিল তা দেখা ওর ঘটে ওঠে নি, বহু বাড়ি-ঘর-বসতিতে সে মাঠের অবলুপ্তি ঘটেছে, 'মাঠের পরে মাঠ' কথার কথা হয়ে উঠেছে আজকাল সর্বত্রই—এই রকমই ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার, কিন্তু এখানে নেমে অবাক হয়ে গেল সে। পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র-রূপে হয়ত এর কোন সৌন্দর্য আছে কিন্তু এখনকার রিক্ত নিঃস্ব

মাঠ একটা ভয়াবহ শূন্যতাই সৃষ্টি ক'রে রেখেছে শুধু। মধ্যে মধ্যে দুটি একটি একক গাছ আছে কিন্তু তাতে সে ভয়াবহতা কমে নি কিছুমাত্র। শ্যামল বনরেখা যা নজরে পড়ে তা এখান থেকে অন্তত এক মাইল হবে—কিম্বা আরও বেশী। মনে হয় লোকালয় বলতে এ দেশেই কিছু নেই, তবে শুনল দূরে দূরে বিস্তর গ্রাম আছে, এখান থেকে ঐসব যে গাছপালা দেখা যাচ্ছে তা সেই সব গ্রামেরই, গাছের আড়ালে পড়ে গেছে বলেই ঘরবাড়ি নজরে পড়ছে না। তবে লক্ষ্য ক'রে দেখলে রান্নার ধোঁয়া নাকি দেখা যাবে এখান থেকেই। কিন্তু সে শুধু শোনাই—চোখে দেখে একবারও মনে হয় না যে ওখানে জনমানব থাকে কোথাও!

ওদের বাসার পিছন দিকটা আরও ভয়ঙ্কর।

সেইদিকেই ইটখোলা। সেও বহু-দূরব্যাপী, বহু বিস্তৃত। যারা ইট গড়ে তারা বোধহয় কাজের শেষে এখন সবাই বাড়ি ফিরেছে, তাদের কাজেব চিহ্নটাই শুধু পড়ে আছে। যতদূর দেখা যায়— কাঁচা ইটেব থাক্ দেওয়া, সেগুলোর আড়ালে কি আছে, কোন বন্য জন্তু কি কোন বদলোক, চোর ডাকাত লুকিয়ে আছে কিনা তা এখান থেকে বোঝবার উপায় নেই। আর তা নেই বলেই সেদিকে চাইলে অকারণে গা-ছমছম কবে।...

অপরাহ্ণ শেষ হয়ে এসেছে তখন, সন্ধ্যা আসন্ন। যা হবার তা হয়েই গেছে, এখন ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। এক এই গো-গাড়ি ক'রেই রওনা হ'তে হয় এখনই, কিন্তু সেটা বড্ড নাটক হয়ে যায়। আর--আর হয়ত পবিত্রর ওপর অবিচারও করা হয় খানিকটা। সে তো সব বলেই এনেছে, এখন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলা মানে—তাকে খানিকটা বিব্রত করা, ক্ষতিগ্রস্ত করা।

অগত্যা নামতে হয় ওকে গাড়ি থেকে, আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এসে বাড়িতেও ঢুকতে হয়।

বাড়ি তো ছাই, একটা ছোট ঘর, তার সঙ্গে উঠানের দিকে

হাত তুই চওড়া রোয়াক একটা। রক্ষা এই যে ভেতর দিকটা পাঁচিল ঘেরা—এবং পায়খানা কুয়াতলা ও রান্নার চালাটা সেই পাঁচিলের ভেতরেই।

ঝি তখনও ছিল। নীলিমা গিয়ে দাঁড়াতে সে এসে সামনে ঢিপ ক'রে এক ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে মুখস্থ বলার মতো গড়গড় ক'রে বলে গেল, রান্নার জল তুলে রেখেছে সে, উনুনে কাঠ সাজানো আছে, বাটনাও বাটা আছে খানিকটা ক'রে, হ্যারিকেন লণ্ঠনে তেল ভরে রেখেছে। বৌ ঠাকরুনের কোন অসুবিধাই হবে না। আর যা কাজ—তা সে কাল, সেই আকাশের পেছনে ছ্যাঁকা না লাগতে লাগতে, এসে ক'রে দিয়ে যাবে। ভাবনার কিছুই নেই।

এই বলে আর একবার সে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে তখনই বাড়ি যাবার উপক্রম করল।

'ও কি,—তুমি, তুমি রাত্রে এখানে থাকবে না?'

'ওমা, রাত্তিরে এখেনে থাকব কী বলো! বলি আমার ঘরবাড়ি দেখবে কি তুমি যেয়ে? ছেলে আছে তুটো, বুড়ী শাউড়ি আছে রাত-কানা—তাদের ছেরাদ্দ চটকায় কে বলো! না—থাকতে-টাকতে আমি পারব নি বাপু।'

'তা আর একটু অন্তত থাকো।'

'ইস, তা আর লয়! চাকী পাটে বসতে চলল,—এখনও আমাকে ঝাড়া তিন পো রাস্তা হেঁটে যেতে হবে।'

সে আর বাদানুবাদের অবসর মাত্র না দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠে পড়ে হন্‌হন্‌ ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রে দিল।

নীলিমা পবিত্রর দিকে চেয়ে বলল, 'তবে যে তুমি বলেছিলে ঝিকে বললে রাত্রেও সে থাকতে পারে?'

'তাই তো ভেবেছিলুম। ভোরবেলাই কাজে আসে, যায় এই সন্ধ্যেয়—তা রাতটুকুই বা থাকতে কি, এই ভেবেছিলুম। আমি একা থাকতুম—সেই জন্যেই আর ওকে থাকতে বলার কোন প্রশ্ন

ওঠে নি। ওর যে আবার ঘরসংসার আছে—অতটা মাথায় যায় নি আমার—'

অপ্রতিভের মতো পবিত্র মাথা চুলকোতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

তবু তখনও স্বামীগৃহবাসের পূর্ণ অর্থটা উপলব্ধি হয় নি।

সে সময়ও আর ছিল না। তখনই কাজে না লাগলে হয় না। সন্ধ্যাটা নতুন জায়গায় বাড়ি-ঘর দেখে শুনে নিয়ে রান্নাবান্না করতেই কেটে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর শোওয়ার ব্যবস্থা করতেও বেশ খানিকটা সময় লাগল। বিছানা কিছু সঙ্গে এনেছিল ওরা। ঘরে থাকার মধ্যে ছিল একখানা কেওড়াকাঠের একানে তক্তপোশ—আর তাতে একটা যৎপরোনস্তি মলিন শয্যা। সেটার চাদর বা বালিশের ওয়াড় বোধহয় মাস-দুই কাচা হয় নি। সে চৌকীর একাধিপত্য পবিত্রকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জন্যে মাটিতেই একটা ব্যবস্থা করছিল নীলিমা—কিন্তু পবিত্র তাতে প্রবল বাধা দিল। এক টানে নিজের সেই চিরকুট ময়লা বিছানাটা মাটিতে নামিয়ে, নীলিমা বাধা দেবার আগেই নিজে শুয়ে পড়ল।

'এখানকার মেঝেতে বড় জল ওঠে, তোমাদের কোন কালে অভ্যেস নেই—এখানে ধরাশয্যা তোমার একদম সহ্য হবে না। তুমি ঐ চৌকীতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ো। ইচ্ছে হয় মশারীটাও টাঙাতে পারো, ব্যবস্থা সব আছে। আমার অত মেহনৎ পোষায় না, আর খুব একটা মশা নেইও, যা আছে তাতে আমার ঘুম আটকাবে না।'

অগত্যা নীলিমাকে সেই চৌকীর ওপরেই একটা বিছানা ক'রে নিতে হয়। স্বামী মাটিতে শোবে আর সে থাকবে চৌকীতে—এটা এখনও তার সংস্কারে কোথায় যেন বাধে। তবু সে-ও ঐ

লোকটার পাশে বিছানা পেতে শোবে—ঠিক সে ব্যবস্থাতেও মন সায় দেয় না।...

এই দ্বিধার জন্যই হোক আর নতুন জায়গা বলেই হোক—নীলিমার ভাল ঘুম হয় নি, একেবারে শেষরাত্রের দিকে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তবু, ঘুম যখন ভেঙ্গেছে তখনও বোধহয় ছটা বাজে নি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখল নিচের বিছানা খালি, ঘরের দরজাটাও খোলা। পবিত্র নিশ্চয় উঠে মুখহাত ধুতে গেছে—কে জানে এখনই বেরোবে কিনা। তাহলে একটু চা—তার সঙ্গে কিছু একটা অন্তত জল-খাবার ক'রে দেওয়া দরকার। কিন্তু বাইরে এসেও কোথাও কোন পাত্তা পেল না পবিত্রর, বাড়িতে তো নেই-ই—মাঠের দিকেও যতদূর দৃষ্টি যায়, ধারে-কাছে কোথাও নেই।

তবে—ঝিয়ের দেখা পেল। সে নাকি 'চাকী' ওঠবার আগেই এসে পৌঁছে যায় রোজ। আজও তাই এসেছে। ঝিয়ের মুখেই শুনল, অত ভোরেই মুখহাত ধুয়ে বেরিয়ে গেছে পবিত্র। কিছুই খেয়ে যায় নি। এমনিই নাকি যায় সে রোজ। কোনদিন দুপুরে ফেরে, কোনদিন ফেরেই না। দুপুরে ফিরলেও অর্ধেক দিন ভাত খায় না—যাহোক কিছু মুখে দিয়ে একটু শুয়ে নিয়েই আবার বেরিয়ে যায়। রাত্রে কখন ও ফেরে ঝি তা জানে না, কারণ সে সন্ধ্যার আগেই দোরে কুলুপ এঁটে বাড়ি চলে যায়। চাবিটা সঙ্কেত-মতো জায়গায় মাটিতে পুঁতে রেখে যায় সে—পবিত্র এসে বার ক'রে নিয়ে দরজা খোলে। চাবি না দিলেও চলে অবশ্য, এখানে 'জন-মনিষ্যি'ই নেই—চুরি করবে কে? তাছাড়া চুরি করবার মতো আছেই বা কি ঠাকুরমশায়ের বাড়ি?

না, পবিত্র রাত্রেও সব দিন খায় না। উনুন সাজানো থাকে, যেদিন ইচ্ছে হয় সেদিন দুটো ভাত ফুটিয়ে খায়—নয় তো এমনি পেটে কিল মেরে পড়ে থাকে।

'উপোষ করতে দাদাঠাকুরের জুড়ি নেই, এ আমি মানব বাপু!' ঝি বলে।

শুনে শরীর হিম হয়ে যাবার কথা, হিমই হয়ে গেল। এইখানে এই জনমানব-অস্তিত্বশূন্য মাঠের মধ্যে খালি বাড়িতে দিনের পর দিন একা থাকতে হবে নাকি? দিন এবং রাত—দুই-ই? পাগল হয়ে যাবে যে!

পরক্ষণেই আবার সান্ত্বনা দেয় মনকে। এতদিন একা ছিল, যা করেছে করেছে। এখন নিশ্চয়ই আর এই রকম বাউণ্ডুলেগিরি চালাবে না পবিত্র। স্ত্রীর কথাটা নিশ্চয় বিবেচনা করবে। দিনে যদি না-ও ফেরে, রাত্রে সকাল সকাল ফিরবে—সন্ধ্যার মধ্যেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে গেল নীলিমা। স্নান ক'রে উঠে রান্নাও করল। দুজনের মতোই রান্না করল সে, ঝি বাড়ি থেকে পান্তা নিয়ে আসে, তাকে কিছু কিছু তরকারী দিল। বলে দিল, 'কাল থেকে তুমি আর পান্তা এনো না হরিদাসী, এখানেই খেয়ো যা হয়।'

রান্না সারা হয়ে গেল বারোটার মধ্যেই। তারপর শুরু হ'ল বসে বসে অন্তহীন পরীক্ষা।

বারোটা, একটা, দুটো।

হরিদাসী ঘড়ি দেখতে জানে না কিন্তু রোদ দেখে বেলা টের পায়। সে বলল, 'তিন পোর বেলা যে গড়িয়ে গেল বৌদি, তুমি আর খাবে কখন? ওসব ভাত তরকারী যে বজ্‌কে উঠবে এবার। সে ঠাকুরের ধারাই এই, তার ওপর ভরসা রেখো নি- উঠে পড়ো, যা হয় দুটো মুখে দাও এবার।'

আগে হ'লে একথা শুনত না, আরও একটু অপেক্ষা করত হয়ত—কিন্তু এখন শুনল। পবিত্রর ভাত বেড়ে রেখে দিয়ে নিজে খেয়ে নিল। এটা আগেই করা উচিত ছিল তার, এতদিনে চেনা উচিত নিজের স্বামীকে—বারে বারে এই কথাই বলতে লাগল

মনকে। স্বভাব না যায় মলে—এ তো মার মুখে বাবার মুখে এমন কি শাশুড়ীর মুখেও বহুবার শুনেছে সে।

দিনের ব্যাপার দেখে রাত্রি সম্বন্ধে আর কোন আশা কি ভরসা রাখে নি নীলিমা। সন্ধ্যার আগে তো ফিরবেই না—রাত্রেও আসবে কিনা সন্দেহ। এ-ই-ই পবিত্র। এ তার আগেই ভাবা উচিত ছিল, উচিত ছিল সাবধান হওয়া, এ ফাঁদে পা না-দেওয়া।

একা নিঃসঙ্গ থাকাব জন্যই প্রস্তুত হ'ল নীলিমা। ঝি থাকবে না রাত্রে তা তো জানাই—তবু একবার বুঝিয়ে বলতে গেল, মিনতি ক'রেই বলল, 'তুমি আর একটু—মানে অন্তত সন্ধ্যেরাতটা কাটিযে যেতে পারো না হরিদাসী? দাদাবাবু তোমার তার মধ্যে না আসেন তুমি চলে যেও—তবু খানিকটাও যদি থাকো তো মনে একটু বল পাই।'

ঝি হাত-পা নেড়ে বলল, 'তার পর? এই তেপান্তর মাঠের পথ আমাকে কে এইগে দেবে শুনি? না বাপু, ও ঠাকুরের ভরসা ছাড়ো। দুপোহর বাতের আগে ও আসবে না, নিশ্চিন্তি থাকো। তার চেয়ে আমি আলোয় ঝালোয় চলে যাই—তুমি দরজায় কুলুপ এঁটে বসে থাকো। দাদাঠাকুরের রা পেলে তবে খুলবে, নইলে খুলো নি। তাও বলি, মনিষ্যির ভয় বিশেষ নেই এখেনে—কীই বা থাকে বলো যে পর-নোক আসবে? তোমার খবর রটে নি তো তেমন—নইলে না হয় সোনা-দানার লোভে আসত। তাও কৈ, ডাকাতি সাকাতি তেমন শুনি না, কালেভদ্রে নমাসে ছমাসে। ভয় জন্তু জানোয়ারের আছে বাপু, মানছি। বাঘ কেন, বুনো শেয়ালের সামনে পড়লেই তো চিত্তির। না বাপু, আমি এগোলুম, আর রাত করব নি।'

হরিদাসী চলে যেতে সে দরজা বন্ধ করল বটে—কিন্তু তালা লাগাল না। লাভ কি?—মনকে বোঝাল ডাকাতই যদি আসে,

দরজা কি আর ভাঙ্গতে পারবে না? তাছাড়াও, কেমন যেন একটা ঔদাসীন্যও বোধ করে সে মনে মনে, চোর ডাকাত আর অবিবেচক স্বামী--সবই যেন সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।...

কিন্তু পবিত্র সেদিন হরিদাসীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ফিরল সন্ধ্যার কিছু পরেই।

তবে একা ফিরল না, সঙ্গে আর একটি অতিথি নিয়ে হাজির হ'ল।

বাইরে থেকে একাধিক লোকের গলার শব্দ পেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল নীলিমা; এমন কি পবিত্র তার নাম ধরে ডাকবার পরও বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল তার, নিজেকে সামলে নিয়ে দরজাটা খুলতে।

তবু, তখনও মনে করেছিল যে কোন মজুর বা ইট-তৈরীর কারিগর--বা ঐ ধরনের কোন লোকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছে। কিন্তু দরজা খুলে স্বামীর সঙ্গীকে চোখে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পবিত্রর সঙ্গে যে এসেছে, সে পবিত্রর থেকেও বয়সে হয়ত ছোট, অত্যন্ত প্রিয়দর্শন একটি তরুণ—তার চেহারা ও বেশ-ভূষা দেখলে ধনীসন্তান বলে চিনতে ভুল হয় না। তার হাতে একটি ছোট বিলিতী স্যুটকেস—অর্থাৎ সে অল্প কিছুক্ষণের জন্য আসে নি, অতিথি হয়েই এসেছে। অন্তত আজ রাত্রিটা তো থাকবেই।

স্বামী সম্বন্ধে বিস্ময়ানুভূতির শেষ হয়ে গেছে ওর—এই রকমই একটা ধারণা ছিল নীলিমার, কিন্তু আজ মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে এখনও অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাকী আছে। এই একখানি মাত্র ঘর, তাতে দুজনের থাকাই কষ্টকর—তার মধ্যে এই রকম সম্ভ্রান্ত একজন অতিথি আনার কথা পবিত্র ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারত না। যে এসেছে তাকে রাতটা অন্তত

থাকতেই হবে, কারণ এতটা হেঁটে এসে আবার এই রাত্রে কোথাও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ছোট্ট ঘরে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একেবারে অপরিচিত—তার কাছে তো বটেই—অনাত্মীয় এক তরুণকে রাত্রি-বাসের জন্য আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসার কথা কী ক'রে ভাবতে পারল লোকটা! আশ্চর্য! নীলিমার কথা না-ই ভাবল, যাকে এনেছে তার কথাও অন্তত ভাবা উচিত ছিল।

হ্যারিকেনের সামান্য আলো, তবু নীলিমার মুখের কাঠিন্য পবিত্রর চোখ এড়ায় নি। সে অনাবশ্যক একটা চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিল। বলল, 'আনন্দকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে এলুম নীলু। সাহেব মানুষ, বিলেতেই আগাগোড়া পড়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে, বাংলা দেশের পল্লী-গ্রাম কখনও চোখে দেখে নি- রবিঠাকুরের কবিতার মধ্যে দিয়ে যা পরিচয়—ভারী রোমান্টিক ধারণা ওর। তাই —সে পাড়াগাঁ যে কী চীজ্ বোঝাবার জন্য নিয়ে এলুম।'

নীলিমা কিন্তু আর সৌজন্য করতে প্রস্তুত নয়, সে কঠিন এবং নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'ধরে তো আনলে—ফিরে যাবেন কি ক'রে এত রাত্রে?'

পবিত্রর মতো নির্লজ্জ লোকও এ প্রশ্নে একটু ঘাবড়ে যেতে বাধ্য হ'ল। আমতা আমতা ক'রে বলল, 'না, না—ফিরবে কি ক'রে। তা নয়—তার মানে থাকবার জন্যেই—'

'হ্যাঁ, তোমার উপযুক্ত কথাই হ'ল এটা। কিন্তু শোবেন কোথায়? মাঠে? হয় ওঁকে এই মাঠে শুতে হয়, নয় তো আমাকে। সেটা ভেবে দেখেছ?'

আগন্তুক বা অতিথি যে—তার এবার বিস্মিত হবার পালা। সে বলে ওঠে, 'সে কি পবিত্রদা, তুমি যে বললে বিস্তর জায়গা, একটুও অসুবিধা হবে না—সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'হবে, হবে। বলেইছি তো। হয়ে যাবেও, তুমি দ্যাখো না। আরে, আর কিছু না হোক্ আমার বিছানা তো আছে। অত

ভাবছিস কেন, সত্যিসত্যিই তোকে মাঠে শুতে হবে না। আয়, ভেতরে আয়।'

একরকম ঠেলেই নীলিমাকে সরিয়ে ভেতরে আসে পবিত্র।

কিন্তু আনন্দ এ অপমানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে কাঠ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বলল, 'মাপ করবেন বৌদি, আমি ঠিক এ অবস্থা জানতুম না। আমাকে কেউ পথ দেখাবার লোক থাকলে এখনও ফিরে যেতে পারি—আমার সঙ্গে টর্চ আছে—'

নীলিমা হাসল। নিরানন্দ নিষ্প্রাণ হাসি। বলল, 'সেটা সম্ভব হ'বে না। সম্ভব যেটা হবে, আপনার দাদার ময়লা চিটচিটে বিছানার একাংশে শুয়ে থাকা, আপনি সেই ভাগ্যের জন্যই প্রস্তুত হোন।'

আর কোন উপায় সত্যিই ছিল না—সুতরাং সেই ভাগ্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হ'ল আনন্দকে। মেঝেতে পাতা বিছানাটা দেখে একবার বোধহয় শিউরে উঠল সে, চৌকীর বিছানাটার দিকেও আড় চোখে দেখে নিল একবার—কিন্তু নীলিমাকে স্থানচ্যুত করা শোভনও নয় সম্ভবও নয়—অগত্যা নিচের বিছানাটাতেই বসে পড়ল কোনমতে। দামী পোশাকটা খুলে অন্য কোন সাধারণ বস্ত্র পরবে—সে উৎসাহও যেন আর রইল না।

নীলিমাও প্রাথমিক রূঢ় ব্যবহারের জন্য বোধহয় একটু অপ্রতিভই হয়ে পড়েছিল, সে নতুন ক'রে রান্না চড়াবার অজুহাতে রান্নাঘরে গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। কেবল পবিত্ররই কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না—সে একাই একশোটা কথা বলে আবহাওয়াকে স্বাভাবিক ও হাল্‌কা ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আহারাদির পর রান্নাঘরের কাজ সারবার নাম ক'রে যতটা সম্ভব সময় কাটিয়ে যখন এ ঘরে এল নীলিমা, তখন পবিত্রর সেই সঙ্কীর্ণ বিছানাতেই দু'জনে শুয়ে পড়েছে, অদ্বিতীয় বালিশটা বন্ধুকে

ছেড়ে দিয়ে খালি মাথাতেই শুয়েছে পবিত্র। তবে তাতে যে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেছে তা মনে হ'ল না, আপাত-গভীর নিদ্রামগ্ন দু'জনেই।

নীলিমাও কোন শব্দ না ক'রে সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। হ্যারিকেনটা গত রাত্রেও কমানো অবস্থায় জ্বলেছিল, আজও সেই ভাবে রেখে দিল সে। এতটুকু ঘরে সম্পূর্ণ একজন পর-পুরুষের সঙ্গে থাকা—আলোটা অত্যাবশ্যক।

ঘুম হবার কথা নয়, হ'লও না বহুক্ষণ পর্যন্ত। দুশ্চিন্তা বিরক্তি তো বটেই—এখানকার এই জীবনযাত্রা সম্বন্ধেও সকাল থেকেই একটা গভীর বিতৃষ্ণা বোধ করছিল সে, তার ওপর এখন এই নতুন অতিথি আগমনের ব্যাপার নিয়ে যে একটা কুটিল সংশয় মনে দেখা দিয়েছে, সেটাও কম অস্বস্তিকর নয়। যে বিষের দাহটা একটু একটু ক'রে কমে এসেছিল—সেটাই যেন আবার নতুন ক'রে অনুভব করছে। ঘরের বাতাসটা যেন আবারও বিষাক্ত লাগছে।

তবু মন যতই উত্ত্যক্ত এবং উদ্বিগ্ন থাক, অল্পবয়সের দেহ তার স্বধর্ম পালন করে। কখন যে সমস্ত তিক্ততা ও দুশ্চিন্তা অবলুপ্ত ক'রে, সকল চৈতন্য আচ্ছন্ন ক'রে চোখের পাতায় গভীর তন্দ্রা নামে তা বুঝতেও পারে না নীলিমা। ঘরের বাকী দুজন অধিবাসীর ঘুম আসবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ে সে।

আর সে ঘুম সহজে ভাঙেও না। একেবারে প্রথম সম্বিৎ পেয়ে যখন ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, তখন রাত আর বেশী বাকী নেই। বাইরের নিবিড় কালো অন্ধকার বেশ খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে।

কিন্তু স্বামী সম্বন্ধে তার আশঙ্কা এই একবার অন্তত মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। ঘুম হোক বা না হোক—হয় নি বলেই নীলিমার বিশ্বাস—দুজনেই যথাসময় পর্যন্ত শুয়ে রইল এবং সকাল বেলা

স্বাভাবিক ভাবেই চা ও জলখাবারের পর্ব চোকা অবধি বাড়িতে রইল। পবিত্রর পক্ষে এটা একেবারেই ব্যতিক্রম। আনন্দ অবশ্য সকালে উঠে চলে যাবার প্রস্তাব করেছিল একবার, কিন্তু পবিত্র তার কথা কানেই তুলল না। চেঁচামেচি ক'রে তার গলা চাপা দিয়ে দিল। জল-খাওয়ার পর দুজনে বেরোল পবিত্রর ইট-খোলার কাজ দেখতে। সেখান থেকে ফিরলও যথাসময়ে। অর্থাৎ বেলা একটার আগে। স্নান আহারও করল সুবোধ বালকের মতো। তার পরও বেরিয়ে গেল—শোনা গেল নদীর দিকে যাচ্ছে তারা। সম্ভব হ'লে কিছু মাছ কিনে কোন মুনিশ বা মজুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে বিকেলের দিকে।

রাত্রির রূঢ়তা দিনে লজ্জার কারণ হয় অতটা আশঙ্কাও আর বোধ করে না নীলিমা--ওদের সহজ আচরণে। বরং পবিত্রর বিছানাটার অবস্থা দিনের আলোয় আর একবার দেখে সঙ্কোচের অবধি থাকে না। সে তাড়াতাড়ি ঝিকে দিয়ে সাবান সোডা আনিয়ে চাদর আর বালিশের ওয়াড় কেচে দেয়। অতিরিক্ত বালিশ নেই—মনে মনে সঙ্কল্প করে আজও যদি আনন্দ থাকে, নিজের বালিশটা ওদের ছেড়ে দিয়ে নিজে কখানা পাট করা কাপড় মাথায় দিয়ে শোবে।

বিকেলে সত্যিই একটা লোক এসে মাছ দিয়ে গেল। অনেক-দিন পরে মন দিয়ে রান্না করল নীলিমা। এটা-ওটা অনেক রকম খাবার তৈরী করল। সেদিনও ওরা ফিরল সকাল সকাল—পবিত্রর পক্ষে সকাল অন্তত—রাত দশটার মধ্যে। নীলিমা উনুনে আঁচ রেখেছিল, গরম গরম হিঙের কচুরী ভেজে দিল। তার ফলে আনন্দরও সঙ্কোচ অনেকটা কমে গেল—হাসি খুশিতে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠল সে, যদি চ কোনক্রমেই সৌজন্য বা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করল না। সেটা বরং পবিত্রই করল কিছুটা, স্ত্রীর ভাব পরিবর্তনে নিশ্চিন্ত ও খুশী হয়ে এমনই চেঁচামেচি শুরু করল যে—তার মধ্যে যে দুচারটে

অশোভন ও শালীনতা-বিরোধী ইয়ারকিও বেরিয়ে গেল—যা শুধু রকে ও রাস্তার মোড়ে চ্যাংড়াদের মধ্যেই করতে শোনা যায়—তা সে বুঝতেও পারল না।

এই ভাবেই কেটে যায় আরও তিনটে দিন।

সেদিন যা অসম্ভব বোধ হয়েছিল—এক ঘরে দুটো পুরুষ-মানুষের সঙ্গে থাকা— এখন অনেকটা সহনীয় হয়ে ওঠে। যদিও প্রতি রাত্রেই যথাসম্ভব কাপড়-চোপড় গুছিয়ে সাবধানে সতর্ক হয়ে শোয় সে।

নীলিমার এই সহজ আচরণে সব চেয়ে খুশী হয় পবিত্র। সে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। নীলিমাকে খুশী করার জন্য এতকালের মধ্যে সে কখনও যা করে নি—অর্থাৎ যথাসময়ে স্নান ও আহার, নিয়মিত সময়ে বাড়ি ফেরা—তা-ই করে।…শেষ পর্যন্ত নীলিমাও নিজের মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে আনন্দর এই অবাঞ্ছিত আতিথ্য গ্রহণে সে উপকৃতই হয়েছে। এখানে এই বিজন-পুরীতে মাঠের মধ্যে একা নিরানন্দ নির্বান্ধব জীবন যাপন করার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সে। এবং এই উপলক্ষে তার স্বামীও যে কিছুটা সামাজিক জীব হয়ে উঠেছে এও কম লাভ নয়।··

এই ভাবেই তিনটে দিন কোথা দিয়ে যেন উড়ে চলে যায়।

চারদিনের দিন রাত্রে খেতে বসে আনন্দ বলে, 'আর নয়, কাল সকালে আমি যাবই।'

'সে কি!' একই সঙ্গে চমকে ওঠে ওরা, স্বামী স্ত্রী দুজনেই,—'এরই মধ্যে?'

আর স্ত্রীও যে চমকে ওঠে, এত শীঘ্র যে আনন্দকে ছেড়ে দিতে তারও অনিচ্ছা—সেটাও পবিত্রর চোখ এড়ায় না।

আর তা যে এড়ায় না—স্ত্রীর এই আগ্রহটুকু লক্ষ্য ক'রে সে যে আরও একবার চমকে ওঠে, সেই এক পলক সময়ের মধ্যেই—এবং

সঙ্গে সঙ্গে তার ঈষৎ-বিস্মিত দৃষ্টিতে যে ক্ষণ কালের জন্য একটা অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে ওঠে, অপ্রত্যাশিত একটা আশার আলো—সেটুকুও নীলিমার চোখে পড়ে।

আরও একবার চমকে ওঠে সেও।

কঠিন হয়ে ওঠে মনে মনে—সতর্কও।

তাই, তারপর পবিত্র অনেক চেঁচামেচি, অনেক অনুরোধ-উপরোধ, ধমক, কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করলেও—নীলিমা সেই প্রথম বিস্ময়োক্তির পর আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। একবার মাত্র, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে, 'আর দু'একটা দিন থেকে যান না—উনি যখন বলছেন—' এই ধরনের অসমাপ্ত এবং নিতান্ত দায়-ঠেলা একটা অনুরোধ জানিয়ে সেই যে চুপ ক'রে, তার পর আর একটি কথাও বলে না।

সে নীরবতাটাও বড় বেশী স্পষ্ট—তবু নীলিমা আজ আর অনুতপ্ত হয় না। বরং সেদিন রাত্রে—অকারণেই, সে আর একবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—সে-রাত্রিটা সে জেগেই থাকবে, অসম্ভব বোধ হ'লে উঠে বিছানায় বসে থাকবে। জেগে থাকেও সে বহুরাত্রি পর্যন্ত। আর জেগে আছে এই ধারণাটা মনের মধ্যে প্রবল থাকে বলেই, তার মধ্যে একসময় যে কখন তার দুই চোখ অত্যল্প কালের জন্য বুজে আসে তা বুঝতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়েও স্বপ্ন দেখে যে সে জেগে থাকার জন্যে সত্যিসত্যিই বিছানায় উঠে বসে আছে।···

তবে খুব একটা বেশীক্ষণ ঘুমোতে পারে না। জেগে থাকবারই চেষ্টা করেছিল, জেগে থাকবে এই প্রতিজ্ঞাই ছিল মনে মনে, যে আবছা অস্পষ্ট সন্দেহটা দেখা দিয়েছে, সেটা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত জেগে থাকাই উচিত তাও জানে—সুতরাং খানিকটা, বোধহয় ঘণ্টা দুই-তিন পরেই হঠাৎ যেন চম্‌কে ধড়-মড়িয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে যায়—আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে নিচের বিছানাটার অর্ধেক খালি, বাকী অর্ধেকের অধিবাসী লোকটি উঠে বসে

নিঃশব্দে তার দিকেই চেয়ে আছে। হ্যারিকেনের আলো তাও কমানো, কিন্তু প্রবলতর কোন আলোর প্রতিযোগিতা না থাকাতে তাতেই বেশ দেখা যায়। ঘরের দরজা অর্ধেকটা খোলা, তাও যেমন পরিষ্কার দেখা যায়—তেমনি ঐ যে লোকটা এদিকে চেয়ে বসে আছে, তারও এই একাগ্র দৃষ্টির পরিপূর্ণ চেহারাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সে দৃষ্টির অর্থ যেন চাবুকের মতো এসে পড়ল—তখনও-অর্ধ-অচেতন ওর মস্তিষ্কের ওপর। কাঁচা ঘুমের জড়তা কাটতে এক লহমার বেশী দেরি হ'ল না—তার পরই এক লাফে বিছানা ছেড়ে একেবারে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল নীলিমা।

এইটুকু ঘরের মধ্যে অপরিচিত পর এক পুরুষ, তার থেকেও পর এবং দূর স্বামী—সুতরাং কাপড়-চোপড় সাবধানে সামলেই শুয়েছিল, কোথাও না এতটুকু শিথিল বা অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। জেগে থাকবার প্রতিজ্ঞা ক'রে ঘুমিয়ে পড়া—একভাবেই ঘুমিয়েছে, ঘুমের ঘোরে এপাশ ওপাশ করারও প্রশ্ন ওঠে নি, এক নিমেষের মধ্যে তাই বাইরে বেরিয়ে আসতে অসুবিধাও হ'ল না।

ঘরের বাইরে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল তখনও সূর্যোদয়ের যথেষ্ট দেরি। শেষা-কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ সবে উঠেছে, তার পাণ্ডু-মলিন আলোর আড়ালে অরুণোদয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। কিন্তু সেই শেষ রাত্রেই বাড়ির দরজা খোলা, গৃহস্বামীরও কোন অস্তিত্ব নেই কোথাও।

আজ আর লজ্জা বা আতঙ্ক—কিছুই বোধ হ'ল না তার, শুধু একটা দুঃসহ ক্রোধে—যেন পা থেকে মাথা অবধি জ্বলতে লাগল। তবু সে প্রাণপণে আত্মদমনই করল, শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনার বন্ধু কোথায় গেছেন তা জানেন ?'

'না-না তো। আমাকে তো কিছু বলে যায় নি। যখন ঘরের দরজা খুলে বেরোচ্ছে তখনই আমার ঘুম ভাঙল। ভাবলুম প্রাকৃতিক কাজে বাথরুমটুমে যাচ্ছে—কিন্তু এখনও তো আসছে না দেখছি। কতকটা সেই জন্যেই আরও জেগে বসে ছিলাম!'

'হ্যাঁ, দরজার দিকে পিছন ফিরে!' শাণিত ব্যঙ্গের সুর বাজে নীলিমার কণ্ঠে, তারপর ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করে সে, 'আপনার কাছ থেকেও অনেক টাকা ধার নিয়েছেন, না? আপনার বন্ধু?'

আব যাই হোক, এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না আনন্দ, সে একটু হকচকিয়েই গেল। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে কোনমতে উত্তর দিল, 'না, হ্যাঁ—মানে—কেন বলুন তো?'

'যা জিজ্ঞাসা করেছি তারই উত্তর চাইছি। আমার প্রশ্ন কি বুঝতে আপনার অসুবিধা হয়েছে? না উত্তর দেবার বাধা আছে কিছু?'

এবার আনন্দও যেন কিছুটা রুখে ওঠে, 'না, অসুবিধে হবে কেন! বাধাই বা কিসের? ঘর থেকে বিনা সিকিউরিটিতে টাকা বার ক'রে দিয়ে তো কিছু চোর হয়ে যাই নি। দিয়েইছি তো, অনেক টাকাই দিয়েছি।'

'তবু, কত—তা জানতে পারি কি?'

'পারেন বৈকি। করকরে বারোটি হাজার টাকা।'

'তা এর সবটাই কি আমার ওপর দিয়ে উসুল হবার কথা ছিল?'

ঠিক এতটা দুঃসাহস আশঙ্কা করে নি আনন্দ। তার এতক্ষণের উদ্ধত ভঙ্গী এই প্রশ্নে কেমন যেন মিইয়ে আসে, সে কোন উত্তর দিতে পারে না, মাথা নিচু ক'রে বসে থাকে।

'কী, উত্তর দিচ্ছেন না কেন? ভিক্ষিজারী করতে এসেছেন, এত চক্ষুলজ্জা করলে চলবে কেন?'

আরও কিছুটা নিরুত্তর থেকে মাথা নিচু ক'রেই উত্তর দেয়

আনন্দ, 'মাপ করবেন বৌদি। প্রশ্নটা যত সহজে করলেন আপনি, তত সহজে এ কথার উত্তর দেবার মতো শিক্ষা আমি পাই নি।'

'কথাটা বলার শিক্ষা পান নি—তবে কাজের শিক্ষাটা পেয়েছেন। কেমন? এখানে এসেছেন কেন? কিসের জন্যে কি লোভে আর কি বন্দোবস্তে এসেছেন তা জানেন না? তবে এখন সে কথাটা খোলাখুলি বলতে এত লজ্জা কিসের?'

এবার জবাব দিতেই হয় আনন্দকে। সেও ভদ্রসন্তান, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। বার বার এ ইঙ্গিতটার অপমান তাকেও যথেষ্ট আহত করে। সে একরকম যেন প্রাণপণ চেষ্টাতেই বলে, 'বন্দোবস্ত কিছুই হয় নি বৌদি, টাকাটা যখন ধার দিয়েছিলাম লভ্যাংশের একটা মোটা অংশ পাব এই আশাতেই দিয়েছিলাম। যখন বুঝলাম সবটাই ফাঁকা, ব্যবসাও নেই তার লভ্যাংশও নেই—তখন স্বভাবতই চাপ দিয়েছিলাম। তারপর—'এইখানে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে লজ্জাটা বোধ করি সামলে নেয় খানিক, 'তারপর, উনি এমনভাবেই আপনার রূপের বর্ণনা করতে লাগলেন বিভিন্ন ছন্দে যে, কিছুদিন পরে মনে হ'ল যে এই ভাবেই ঋণটা ওয়াশিল দিতে চান উনি -আর তাতে আপনারও বিশেষ আপত্তি নেই।'

এতক্ষণ দুঃসহ উষ্মার বশেই এতটা নির্লজ্জ হ'তে পেরেছিল নীলিমা—সে উষ্মা প্রশমনেরও কিছুমাত্র কারণ ঘটে নি—তবু যেন আনন্দর এই কথাটা শোনার পর একেবারে পাথরে পরিণত হয়ে গেল সে। অপ্রিয় সত্য মানুষ আশঙ্কা করে, অনেক সময় প্রতিপক্ষের মুখের ওপর সে আশঙ্কাটা ছুঁড়েও দেয়—তবু মনের কোন্ গোপন কোণে একটা আশা থাকে যে হয়ত অপর পক্ষ এব একটা জোর প্রতিবাদ করবে, আর সে প্রতিবাদ হয়ত সম্পূর্ণ মিথ্যাও হবে না। তাই সে সব ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ অভিযোগ স্বীকার ক'রে নিলে সে স্বীকৃতিতে নিজের সমর্থন লাভ ক'রে মানুষ উল্লসিত হয় না—বরং আহতই হয়।

নীলিমার বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। আনন্দর মুখের ওপর স্বামী সম্বন্ধে তার আশঙ্কা বা অভিযোগ যখন ছুঁড়ে মারছিল তখনও বোধ করি ওর মনের মধ্যে কোথায় একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে আনন্দ প্রবল একটা প্রতিবাদ করবে, বলবে যে এ কথা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু সে সব কিছুই করল না আনন্দ, অভিযোগটা পুরোপুরি মেনেই নিল। আর তার ফলে—এইবার—ও নিজের কাছেই স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, মুখে যতই যা বলুক, এই সহজ স্বীকৃতির জন্য সে মনে মনে ঠিক এতটা প্রস্তুত ছিল না।

তার সেই পাষাণের মতো ভাবলেশহীন নিস্পন্দ মুখের দিকে চেয়ে আনন্দ বোধ করি ভুল বুঝল, উঠে দাঁড়িয়ে নিজের স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে বলল, 'আপনি দরজা বন্ধ ক'রে বসুন বৌদি, আমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করছি। একটুখানি বিশ্বাস করুন আমাকে—ভোর হওয়া মাত্র চলে যাব আমি, আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হবে না, বা আমার জন্যে আপনাকে লাঞ্ছিত হ'তে হবে না।'

এইবার যেন পাষাণে প্রাণ ফিরে আসে আবার।

সে দরজা আগলে দাঁড়ায়, বলে, 'দাঁড়ান, এ অন্ধকারে কোথাও যাওয়া যাবে না। আপনি স্থির হয়ে বসুন, আমি একটু চা করি --চা খেয়ে মুখহাত ধুয়ে তৈরী হোন, ততক্ষণে ভোর হয়ে যাবে, ভোর বেলাই এখানকার ঝিও এসে পড়ে। সে এলে একটা গাড়ি আনাবার ব্যবস্থাও করতে পারব।'

'কিন্তু তার কোন দরকার হবে না বৌদি—আমি এমনি হেঁটে চলে যেতে পারব—পথ জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে।'

'দরকার আপনার নয়, দরকার আমার। আমিও আপনার সঙ্গে যাব যে। হাঁটতে আমিও হয়ত পারতুম কিন্তু পথ চিনতে পারব না। জিজ্ঞাসা করার মতো লোক এখানে পাওয়া যাবে না কোথাও ধারে-কাছে।'

'আপনি—আপনি আমার সঙ্গে যাবেন ?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না আনন্দ।

'কেন যাব না ? আপনি তাকে তাড়ালেন, এখন আপনার সঙ্গে যাওয়া ছাড়া গতি কি। আর আপনি তো তবু মানুষ, ওর সঙ্গে যদি এখানে আসতে পেরে থাকি তো আপনার সঙ্গে যেতে পারব না কেন ? ··আপনি বসুন, আমি উনুনে কাঠ জেলে চা করিগে—'

বেশ সহজ ও শান্তভাবেই কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

সহজ ও শান্তভাবেই ঝিয়ের হাতে বাড়ির ভার দিয়ে আনন্দর সঙ্গে গোরুর গাড়িতে চাপল নীলিমা। তেমনি সহজভাবেই এসে কলকাতার বাড়িতে উঠল—একা। শাশুড়ীর বিস্মিত ব্যাকুল প্রশ্ন তেমনি সহজ ঔদাসীন্যের সঙ্গে এড়িয়ে গেল। শুধু মুখ খুলল একেবারে শ্বশুরের কাছে। তাঁকেই সব কথা জানাল সে, একটি কথাও গোপন করল না। খুব সহজেই বলল, বেশ শান্তভাবে। বলা শেষ ক'রে সহজ ও শান্ত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, কেমন ক'রে অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠতে লাগল তাঁর মুখ—চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর তেমনি সহজেই নিজের জীবনের পথ বেছে নিল সে। পথ ও অবশিষ্ট জীবনের বেশ।

সে পথ পতিগৃহ ত্যাগের পথ।

সে বেশ বৈধব্যের বেশ। ভবিষ্যৎ কালে আত্মরক্ষার বর্মও বটে।

আগে আত্মরক্ষার কথা ভাবে নি। শুধু বিবাহটাকে অস্বীকার করা নয়—তথাকথিত স্বামীর অস্তিত্বটাকেও অস্বীকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে এটা আত্মরক্ষার কাজেও লাগল। শুধু বৈধব্যের বেশে ব্যাহত হয়েই বহু লোলুপ দৃষ্টি ফিরে যায়, যারা ভদ্রলোক তাদের কাছে সহানুভূতি এবং সাহায্য পাওয়া যায়।

আর তাতেই দাঁড়াতে পেরেছে।

এক পয়সাও না নিয়ে বেরিয়েছিল সে শ্বশুরবাড়ি থেকে।

প্রতিজ্ঞা ছিল যে কোন আত্মীয়ের বাড়ি যাবে না, কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে সাহায্য চাইবে না।

শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে কী খেয়ালবশে সোজা চলে গিয়েছিল

এক হাসপাতালে। বলেছিল, 'কাজ করব, যে কোন কাজ দিন। শুশ্রূষার কাজও জানি।'

তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, শুধু শিক্ষিত মেয়ে হ'লেই হবে না, শিক্ষিত নার্স হওয়া চাই। এখন নীলিমা যা পেতে পারে তা হ'ল আয়া বা দাসীর কাজ। রোগিণীরা নিজস্ব পরিচর্যার জন্য রাখেন, বারো ঘণ্টায় মাত্র দু-টাকা ব্যবস্থা। তাতেই রাজী হয়েছিল সে। রাজী হ'তে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের করুণায় এবং এক নার্সের সহানুভূতিতে নার্সদের কোয়ার্টারে স্থানও পেয়েছিল একটু।

কিন্তু এ-রকম মেয়েকে আয়া হিসেবে রাখতে রোগিণীরা কুণ্ঠিত বোধ করেন, তাকে সে কাজ দিয়ে কর্তারা লজ্জিত হন। তাই অনেক তদ্বির ক'রে তাঁরা একটা নতুন চাকরি সৃষ্টি করলেন ওর জন্য। দাসী থেকে কর্মচারী পদবী পেল সে।

এইখানে কাজ করতে করতেই একটা মাষ্টারীর চাকরি পেয়ে গেল সে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখতে লিখতেই একটা কাজ মিলে গেল।

মাষ্টারী করতে করতেই এম. এ. পাস করল। তারপর বি. টি.। সে স্কুল থেকে বর্তমান স্কুলে এল হেড্ মিস্ট্রেস হয়ে। এখানেও বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল, কোন্ এক এ. রায় সেক্রেটারী হিসেবে সই ক'রে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট-চিঠি পাঠিয়েছিলেন—অত বুঝতেও পারে নি। স্কুলে এসেও কয়েকদিন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হয় নি। কে এক মিঃ রায় বিখ্যাত ব্যবসায়ী, বর্তমানে বুঝি এম-এল-এ একজন—তিনিই সেক্রেটারী, এই পর্যন্ত শুনেছিল।

দেখা হ'ল একেবারে একটা মিটিং-এর দিন।

এ দেখার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না নীলিমা। সে মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেল একেবারে। ওর মুখ দেখে মনে হ'ল কোন্

অদৃশ্য ডাকিনী বুঝি তার সমস্ত রক্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছে।…এই এম.এল.এ. সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী এ. রায় যে সে রাত্রের সেই একান্ত অবাঞ্ছিত অতিথি আনন্দ রায় তা একবারও কল্পনা করে নি সে।

কিন্তু আনন্দ নির্বিকার। সে যে ওকে চিনতে পারল তা একবারও মনে হ'ল না। পরিচয়ের এতটুকু জ্যোতিও ফুটল না তার দৃষ্টিতে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যে সৌজন্য বিনিময় করে মানুষ—তার বেশী এতটুকুও ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেল না তার কথাবার্তায় বা আচার আচরণে। সাধারণভাবে সভার কাজ শেষ ক'রে সহজভাবেই বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

কিন্তু নীলিমা এবার আর পারল না অতটা সহজ হ'তে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার, কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম অপমান-বোধ আঘাত করছে। বাড়ি ফিরে এসে রান্নাখাওয়ার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারল না-- শুধু মনে মনেই নয়, দৈহিক অর্থেও —ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াতে লাগল। বসে, শুয়ে, পায়চারী ক'রে কিছুতেই স্বস্তি পেল না। কোন সিদ্ধান্তেও উপনীত হ'তে পারল না। এ চাকরি ছাড়লে অবস্থা হয়ত সঙ্গিন হয়ে উঠবে ; এমন সঞ্চয় নেই যে দীর্ঘদিন চালাতে পারবে চাকরি না থাকলেও। অথচ এ অবস্থার সঙ্গেও নিজেকে যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না।

শেষে প্রায় সারারাতই বিনিদ্র কাটিয়ে ভোর বেলা একটা পদত্যাগপত্র লিখে ফেলল। সকালবেলাই স্কুলের চাকর এসেছিল কতকগুলো কাগজপত্র সই করাতে—তার হাত দিয়ে একেবারে আনন্দর বাড়িতেই পাঠিয়ে দিল চিঠিটা।

ঘণ্টাখানেক পরেই আনন্দ এসে উপস্থিত হ'ল।

দরজা খুলে ওকে দেখে নিমেষের জন্য নীলিমার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল—কিন্তু তাকে কোন রূঢ়তার সুযোগ দিল না আনন্দ, দু-হাত জোড় ক'রে বলল, 'ইচ্ছে করলে আমাকে ফ্ল্যাটের ভেতরে

নাও ঢুকতে দিতে পারেন, প্রয়োজনও নেই—আমার যা বক্তব্য আমি বাইরে থেকেই বলে চলে যাচ্ছি।

একটু নরম হ'ল নীলিমা, বলল, 'না, ভেতরেই আসুন।'

পথ ছেড়ে দিয়ে ভেতরে নিয়ে এল, একটা চেয়ারও এগিয়ে দিল।

আনন্দ ওর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে পড়ে পকেট থেকে সেই পদত্যাগপত্রটা বার ক'রে বিনা-ভূমিকাতেই বলল, 'বলছিলুম এইটের কথা।···এর কি কোন দরকার আছে? আপনি কেন যাবেন? বহু কষ্ট করেছেন আপনি। ভাববেন না আমি এমনি কথার কথা বলছি। আমি আপনার সব খবরই রেখেছি, এখনও রাখি। অনেকবার লোভ হয়েছে কিছু সাহায্য করবার—আর্থিক সাহায্য ছাড়াও কিছু সহায়তা করতে পারতুম—কিন্তু আপনি অসম্মানিত বোধ করবেন এই ভয়েই পিছিয়ে গেছি, ক্ষতির ওপর অপমান যোগ করার প্রবৃত্তি হয় নি।··নার্সের চাকরি থেকে এম. এ. পাস ক'রে মাষ্টারী নেওয়া পর্যন্ত সব ইতিহাস জানি। এই চাকরির জন্যও আমাকে বিস্তর ফাইট করতে হয়েছে—এক ভদ্র মহিলা তিনজন মেম্বারকে হাত করেছিলেন, অথচ আমি জানি তাঁর স্বামী প্রচুর রোজগার করেন, তাঁর চাকরি কতকটা শখের।···না, না, এ চাকরি ছাড়বেন না, প্লীজ, আমার জন্যে আবারও আপনার ক্ষতি হ'তে দেব না। তার চেয়ে, যদি খুব অস্বস্তি বোধ করেন, আমিই বরং সেক্রেটারীশিপ ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার কি খুব দরকার হবে? বছরে আর ক'টা দিনই বা আমাদের দেখা হচ্ছে-বলুন?'

ইতস্তত করে নীলিমা, আনন্দর যুক্তি খণ্ডনের মতো কোন যুক্তিই খুঁজে পায় না। এখন সত্যিই ব্যাপারটাকে ছেলেমানুষি বলে বোধহয়, অথচ লজ্জায় সে কথাটাও স্বীকার করতে পারে না।

ওর মনের ভাব আনন্দ বোঝে বোধহয়, সে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে যায়।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে।

মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে তাদের। স্কুলের মিটিং-এ তো বটেই, এমনিও পথে-ঘাটে বাজারে দোকানে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে।

মিটিং ছাড়াও কাজ থাকলে আজকাল ইস্কুলে চলে আসে আনন্দ; আগে এসব কাজ চাকর পাঠিয়েই সারা হ'ত, আজকাল—নীলিমার মনে হয়—তাকে দেখবার জন্যই কারণগুলো কাজে লাগায় ও।

কিন্তু তাতে আপত্তি করার মতো কিছু খুঁজে পায় না নীলিমা। আনন্দ যে ছুতো ক'রে আসে তার কোন প্রমাণ নেই। কাজের অতিরিক্ত একটি মিনিটও সে বসে থাকে না বা গায়ে পড়ে অকারণ গল্প জমাবার চেষ্টা করে না। সব দিকেই নিখুঁৎ ব্যবহার তার। চিন্তা ক'রেও তার আচরণে কোন অভব্যতা বা অশোভনতা খুঁজে পায় না। ফলে—একটু একটু ক'রে নরমই হয় নীলিমা, কোথায় যেন এই প্রিয়দর্শন ভদ্র মানুষটার জন্য একটা মমতাও দেখা দেয় মনের মধ্যে। মমতা বোধ করে তার কারণ—এর মধ্যেই অন্যান্য সহকর্মিণী মারফৎ সংবাদটা সংগ্রহ করেছে—আনন্দ সংসারে একেবারে একা, তাকে স্নেহ করার ভালবাসার কেউ নেই। মা বাবা গত হয়েছেন, পিসী মাসী বা তেমন আশ্রিতা কেউ নেই—এখনও বিয়ে করে নি। চাকরবাকরদের ওপরই সংসার। বিপুল বিত্ত ওর, অর্থ, প্রতিষ্ঠা, রূপ এবং চরিত্রের খ্যাতি—কোনটারই অভাব নেই, তবু কেন যে ওর আজও বিয়ে হয় নি বা করে নি—সেইটেই সকলের কাছে দুর্বোধ্য।

আরও কিছুদিন এমনি সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রাখার পর, একদিন মিটিং-এর শেষে নিজের গাড়িতে ক'রে বাড়ি পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করে আনন্দ। সেদিনও নীলিমা 'না' বলার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না।

ইতস্তত করতে করতেই এক সময় গাড়িতে এসে বসে এবং বসার পর নিজের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—যদি কিছু মাত্র অশোভন আচরণ করে আনন্দ তাহ'লে রীতিমতো অপমান করবে সে, আর কখনও যাতে গাড়িতে লিফ্‌ট্ দেবার প্রস্তাব করতে সাহস না করে!

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা পালনের সুযোগ মিলল না। আনন্দ না করল কোন অশালীন আচরণ, আর না করল এতটুকু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা। বাড়ির সামনে এসে নিজে নেমে পিছনের দরজা খুলে ওকে নামিয়ে দিল কিন্তু ওর সঙ্গে ওপরে পর্যন্ত যাবার কোন চেষ্টা বা প্রস্তাবও করল না। বরং নীলিমা ফুটপাথে নেমে দাঁড়ানো মাত্র একটা নমস্কার জানিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল।

নীলিমাও যেন এতটা আশা করে নি।

বুঝি সে ক্ষুণ্ণই হ'ল একটু তার অবচেতন মনে।

এর পর আরও দু-চারদিন এমনি লিফ্‌ট্ দেয় আনন্দ। কোন কোন দিন বা পথে দেখা হয়ে যায়, কোন দিন বা গড়িয়াহাটের মোড়ে কিম্বা কোন দোকানের সামনে। এই ভাবে দেখা হয়ে গেলেই—যত কাজই থাক, ওকে গাড়ি ক'রে পৌঁছে দিয়ে যায় আনন্দ কিন্তু কোনদিনই ওপরে ফ্ল্যাট পর্যন্ত সঙ্গে যায় না।

অবশেষে নীলিমাই লজ্জিত বোধ করে।

একদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে বসায়, চা ক'রে খাওয়ায় নিজের হাতে।

মনের মধ্যে যেটুকু সঙ্কোচ বা গ্লানি ছিল তার—আনন্দর এই যথার্থ ভদ্র আচরণে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। এখন ও নিজেই নিজেকে বোঝায়, সেদিনের সে ব্যাপারটাতে আনন্দর খুব একটা দোষ ছিল কি? সেদিনও তো সে কোন অভদ্র আচরণ করে নি, তার অসহায় অবস্থার বিন্দুমাত্রও সুযোগ নেয় নি। আর তা

করে নি বলেই তো তার সঙ্গে নীলিমা অনায়াসে চলে আসতে পেরেছিল।

এর পর স্বাভাবিক ভাবেই আসা-যাওয়া শুরু হয়। তবে খুব ঘন ঘন নয়, যতটা পর্যন্ত শোভন—তার বেশী কোন ঘনিষ্ঠতাই করতে চায় না আনন্দ। বরং সহজ একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়—এই যেন ওর উদ্দেশ্য।

এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ধরেই একদিন ওর বিয়ের কথাটা তুলেছিল নীলিমা।

রহস্যছলে—বিয়ে না কবার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন বিয়ে করে নি আনন্দ,—সেই রহস্যটা জানতে চেয়েছিল।

খুব লঘুভাবেই তুলেছিল কথাটা।

আর হাল্‌কা পরিহাসের বদলে হাল্‌কা পরিহাসেই উত্তর পাবে—এই আশা করেছিল।

কিন্তু আনন্দ অতটা লঘুভাবে নিতে পারে নি, বরং গম্ভীরই হয়ে উঠেছিল, তার সদাপ্রদীপ্ত মুখে একটা অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল।

চোখটা নামিয়েছিল সে নীলিমার চোখের ওপর থেকে। তারপরও, বহুক্ষণ আর মুখ তুলে চাইতে পারে নি ওর দিকে।

অনুতপ্ত নীলিমা তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'মাপ করবেন, অতটা বুঝতে পারি নি। সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা এটা—না করাই উচিত ছিল। মনে হচ্ছে না জেনে কোন ব্যথার স্থানে আঘাত ক'রে ফেলেছি।'

এবার একটু হাসে আনন্দ কিন্তু সেও অপ্রতিভের হাসি, সে হাসিতে খুশির আভাস পর্যন্ত থাকে না। বলে, 'না না, আপনার এত কুণ্ঠিত না হ'লেও চলবে। এ প্রশ্ন তো বহু লোকই করে—আর নিত্যই কাউকে না কাউকে এর উত্তর দিতে হয়। সুতরাং আপনি আর কি অপরাধ করলেন? যা স্বাভাবিক, যা আর যে কোন

মহিলাই করতেন কিছুটা পরিচয়ের পর—আপনিও তাই করেছেন। ...তা নয়, কুণ্ঠার কারণ আমারই—কী উত্তর দেব তাই ভেবে পাচ্ছি না। আপনাকে মিথ্যা বলতে ঠিক মন সায় দিচ্ছে না, অথচ সত্যটা বলাও খুব কঠিন।'

'কেন বলুন তো?' মুহূর্তের অসতর্কতায় প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে। এতদিনের সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছাপিয়ে কৌতূহলেরই জয় হয়। ওর ঐ কথাব পর আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা একান্ত অশোভন জেনেও—প্রশ্নটা না ক'রে যেন পারে না।

'কেন?' আবাবও একটু ম্লান হাসি হাসে আনন্দ, অল্প কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলে, 'মুশকিল হয়েছে কি জানেন, কারণটা আপনাকে জানাতে পাবলেই আমি সব চেয়ে খুশী হই, এতকাল ধরে আপনাকেই জানাবার সুযোগ খুঁজছি কিন্তু তবু কিছুতেই যেন আর ভরসায় কুলোচ্ছে না। সেইজন্যই এত সঙ্কোচ আমার, এত কুণ্ঠা।'

এবার নীলিমাও গম্ভীর হয়ে ওঠে।

সত্যটা সে যেন আন্দাজ করতে পেবেছে কিছুটা।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছে তার।

মস্ত একটা ভুল ক'রে বসেছে সে, পর্বতপ্রমাণ ভুল। এ প্রসঙ্গটা তোলা তার কিছুতেই উচিত হয় নি। সম্ভাবনার কথাটা ভাবা উচিত ছিল তার, এমন ক'রে অন্ধের মতো চোরা-বালিতে এসে পড়া নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। এখন অন্য প্রসঙ্গ তুলতে পারলে হয়ত নিষ্কৃতি পায় কিন্তু কিছুতেই, মনের কাছে হাজার মাথা খুঁড়েও, তেমন কোন প্রসঙ্গের কথা খুঁজে পায় না।

ওর এ মুখভাব আনন্দর চোখে পডে না, কারণ সে মাটির দিকে চেয়ে ছিল। সে আবারও আস্তে বলে, 'যদি বলি বিয়ে করার মতো কোন মেয়ে খুঁজে পাই নি—বিশ্বাস করবেন?'

'করব বৈকি! কেন করব না। সত্যিই তো, আপনার উপযুক্ত পাত্রী পাওয়া যে খুব সহজ নয়—তা আমিও তো জানি!'

কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরে যেন বেঁচে যায় নীলিমা। কণ্ঠস্বরে তাই অকারণেই জোর দেয় খানিকটা।

কিন্তু এবারেও তার দিকে চায় না আনন্দ। তেমনি ভাবেই বলে, 'উপযুক্ত কিনা জানি না, মনের মতো একটিই মেয়ের দেখা পেয়েছিলুম জীবনে—তবে তাকে পাবার নয়, পাবার কোন উপায় নেই ; তাই মনে হয়—ওকাজটা বোধহয় আর হয়েই উঠবে না কোনদিন। · আচ্ছা, আসি আজ, নমস্কার।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময়ও নীলিমার মুখের দিকে চাইতে পারে না সে।

এরপর আর বহুদিন আসে নি এখানে আনন্দ।

ওকে পৌঁছে দিয়ে গেছে দু একবার—কিন্তু ওপরে ওঠে নি, নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছে এই নিভৃতে দেখা হওয়াটা। নীলিমাও জোর করে নি, জোর করার মতো মনের জোরটা যেন চলে গেছে ওর—কবে কেমন ক'রে গেল তা ও নিজেই জানে না। তবে এইটুকু জানে যে আনন্দকে দেখলে অকারণেই খুশী হয় ওর মন, তার ক্লান্ত চোখের দিকে চাইলে সহানুভূতিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে—সে ক্লান্তি সর্বপ্রথমে মুছে নিতে ইচ্ছা করে, তার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করার কথা মনে করলেই বুকের মধ্যে কাঁপে, পা দুটো কেমন দুর্বল বোধ হয়।

ইদানীংকার ওর যা কিছু চিন্তা আনন্দকে নিয়েই—সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনের কাছে স্বীকার করতে হয় ওকে। সেই জন্যেই সেও এড়িয়ে যেতে চায় আনন্দকে, সাহস হয় না ওর আনন্দর সঙ্গে নিরিবিলি কথা কইতে।

তবুও আজ যে কেন হঠাৎ টেলিফোন ক'রে বাড়িতে একবার আসতে বলেছিল আনন্দকে—তা ও নিজেই জানে না।

রিসিভার নামিয়ে রেখেই অনুতপ্ত হয়েছিল। তখনই আবার ডেকে বারণ করার কথাও মনে হয়েছে একবার—বড় বেশী নাটুকেপনা হবে বলেই পারে নি।

কিন্তু এখন দেখছে বলে ভালই করেছে।

পবিত্রর নির্লজ্জতার বিষে সর্বাঙ্গ জ্বলছিল তার—আনন্দর সহানুভূতিব প্রলেপে সে জ্বালা অনেকটা কমেছে।

ক্ষতি হয়েছে আনন্দরই।

সে এই আহ্বানে অনেকখানি আশা নিয়েই ছুটে এসেছিল।

সাহস ক'রে এতদিন পরে তার সে গোপন আশার শতদলটি মেলেও ধরেছিল ওর উজ্জ্বল দৃষ্টির প্রদীপ্ত আলোকে।

সে বলেছিল, সেপাবেশনের সব ব্যবস্থা সে ক'রে দেবে। এ সংবাদ যাতে কোন কাগজে না বেরোয় তার সব দায়িত্ব নেবে সে। কোথাও কোন জানাজানি হবে না। নীলিমাকে এতটুকু লজ্জায় পড়তে হবে না। শুধু নীলিমা যদি দয়া ক'রে রাজী হয়—তাহ'লেই কৃতার্থ হয়ে যাবে সে।

আবেগের বশে, যা কখনও করে না, ওর হাত দুটো ধরে ফেলে বলেছিল, 'তোমার জন্যে আমি তপস্যা করেছি নীলিমা, তুমি বিশ্বাস করো। তুমি ছাড়া আমার জীবনে কোন আনন্দ নেই, জীবনের কোন উদ্দেশ্য, কোন সার্থকতা নেই!'

বাধা দেয় নি নীলিমা, হাতও ছাড়িয়ে নেয় নি। শুধু বলেছিল, 'বিশ্বাস করছি। চিরদিনই বিশ্বাস করেছি তোমাকে। অবিশ্বাসের কোন কারণও ঘটে নি, তবু পারব না—এটা তুমিও বিশ্বাস করো। আজও আমার শ্বশুর মশাই বেঁচে—তিনি বড় স্নেহ করেন আমাকে, বড় বিশ্বাস করেন। কখনও একটি কটু কথা বলেন নি, কখন আমাকে কোন তিরস্কার করেন নি। তিনি আমার বাবার চেয়েও বড় আমার কাছে, দেবতার মতো মনে করি তাঁকে। তাঁর মনে এত বড় আঘাত দিতে পারব না। আমার বৈধব্য বেশ সয়েছে তাঁর কিন্তু

আবার নতুন ক'রে—তাঁর ছেলে বেঁচে থাকতে—সীমন্তে সিঁদুর হাতে আভরণ তাঁর সইবে না। সে আঘাত সহ্য করতে পারবেন না—আমি বেশ জানি। তিনি মনে করেন একাজ কোন সদ্বংশের মেয়ের যোগ্য নয়—তিনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন কোন নীচ কাজ আমার দ্বারা যেন না হয়—সে আশীর্বাদ বা প্রার্থনা মিথ্যা করতে পারব না, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

ক্ষমা করেছে আনন্দ, ক্ষমা চেয়েও গেছে।

আশাও সে ছাড়ে নি একেবারে, তাও জানিয়ে গেছে।

জয়দেব সপ্ততীর্থ অমর নন, তা নীলিমাও জানে।

কিন্তু, জয়দেব গত হলেই কি পারবে নীলিমা আনন্দর জীবনকে সার্থক করতে, সুন্দর করতে—আনন্দময় করতে ?

কে জানে।

কোথায় যেন একটা সংশয় থেকে যায় মনের মধ্যে।

শুধু কি জয়দেব সপ্ততীর্থই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন এই শেষ মুহূর্তে—আবার সুখী হওয়াব, আবার সার্থক হওয়ার পথে ?

অস্পষ্ট আবছা একটা সংশয় একটা দ্বিধা কেন এমন ক'রে কাঁটার মতো মনে বিঁধছে ?

ঐ যে অপবিত্র পশুটা—যার উপস্থিতিতে এই ঘর ঐ চেয়ারটা অশুচি হয়ে গেছে বলে তার বিশ্বাস—তার সম্বন্ধে কি সত্যিই কোন দুর্বলতা আছে এখনও ?

তাও কি সম্ভব ?

শ্বশুরের চিরায়ুষ্মতী হবার আশীর্বাদটা কি এমনি সংঘাতিক ভাবে সফল হবে তার জীবনে ?

ও কি এখনও অপেক্ষা করছে মনে মনে, ঐ পশুটারই মানবত্বে উত্তীর্ণ হবার ?

আনন্দর মুখেই শুনেছে সে চাকরি করছে, বেশ কিছুদিন ধরেই করছে। বাড়িতে থাকে না, কোথায় ঘর ভাড়া ক'রে থেকে নিজে

রেঁধে খায়। আপিস ছাড়া কোথাও আর যায় না, কারও সঙ্গে মেশে না। চাকরিও নাকি ভালভাবেই করছে। প্রাইভেট ফার্ম—উন্নতিও হয়েছে ঢের। বাড়িতে বাবাকেও নাকি টাকা দিতে গিয়েছিল, তিনি নেন নি। তিনি ওর মুখের দিকে চান না, ও গেছে আভাস পেয়েই দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে বসেন। পবিত্রও কথা কওয়ার চেষ্টা করে না, মার সঙ্গে যখন দেখা করতে যায়—দূর থেকে প্রণাম ক'রে চলে আসে।

এ সবই শুনেছে সে, অনিচ্ছাতেও শুনেছে। আনন্দকে এ প্রসঙ্গ তুলতে বারণ করেছে—তবু কথার ফাঁকে ফাঁকে খবরগুলো বেরিয়ে এসেছে। আর সেগুলো মনেও আছে এখনও।

তবু বিশ্বাস করে নি, এখনও করে না।

আর সম্ভব নয় ওর পক্ষে মানুষ হওয়া—মনে মনে জোর দিয়েই বলে নীলিমা।

তবু কেন পারল না আনন্দর এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে?

কেন? কেন?

সেই উত্তরটাই খোঁজে সে সারারাত বিনিদ্র থেকে। আর প্রাণপণে উত্তরটাকে এড়াতে চেষ্টা করে।

॥ শেষ ॥